মাস্টারমশাই সমীপেষু

মেচবাহার সেখ

মাস্টারমশাই সমীপেষু

প্রথম খন্ড

মেচবাহার সেখ

মাস্টারমশাই সমীপেষু
(Mastermoshai Somipeshu)

কপিরাইট: মেচবাহার সেখ

প্রকাশ: ২১শে জুন, ২০০৬
সংশোধিত সংস্করণ: জুন, ২০১০
প্রকাশক: এস নাহার, এস এন পাবলিশিং,
৫, শ্রীনাথ বাবু লেন, কলকাতা-৭০০০৭৩

বিশেষ পরিমার্জিত অলঙ্কৃত সংস্করণ মে, ২০১৬
সৌজন্যে: অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড, দক্ষিণ, কলকাতা-৭০০০৩১

প্রচ্ছদ: মানবেন্দ্রনাথ পাল
অলংকরণ: মানবেন্দ্রনাথ পাল

মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ প্রার্থিত অনুদান: ৩০/-

নান্দীমুখ

বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যে মানুষটি বিদ্যালয় শিক্ষার ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলা প্রেক্ষিতে নিজের ভাবনা এবং অনুশীলন জারি রেখেছেন ও যার লেখনীতে ধরা পড়েছে প্রাকৃত-প্রান্তিক বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন রুপ তিনি মেচবাহার শেখ। পেশাগত পরিসর যার ভাবনার বৃত্তকে সীমায়িত করতে পারেনি, যার চিন্তার নিজস্বতাকে ম্রিয়মান করতে পারেনি, যিনি এখনো ছক-ছিন্ন করা চিন্তার দিগন্তে অপলক তাকিয়ে থাকেন আর নিজেকে পরিচয় দিতে ভালবাসেন জগত চরাচরের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে-এহেন মানুষটির বেশ কয়েকবছর পূর্বে প্রকাশিত এই বইটির পুনঃপ্রকাশ আমরা জরুরি মনে করেছি।

কারণ এই বইতে ধরা পড়েছে চির-চঞ্চল এক সমাজচিত্র। এখানে প্রথম প্রজন্মের বিদ্যালয়যাত্রী একদল কিশোর-কিশোরীর বয়ানে ধরা পড়েছে আমাদের ধূসর বিদ্যালয় ব্যবস্থার তীব্র বিভেদ-ভঙ্গুর রুপ। এর পাশাপাশি আমরা পাচ্ছি একদল মননহীন শিক্ষককে যারা পাঠদান আর শিক্ষাদানের ভিতরে কোনো বিভেদ করেন না।

প্রতিটি ছাত্রের নিজস্ব বয়ানে ধরা পড়েছে তাদের ভয় এবং তীব্র অনপনেয় হতাশার ছবি আর এই ছবিতে আমরা মেচবাহার সাহেবকে পেয়ে যাই।

বাংলার লক্ষ লক্ষ প্রাকৃত-প্রান্তিক মানুষের পক্ষ থেকে তার জন্য অভিবাদন রইল।

অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে

বইটি প্রকাশিত হবার পর সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে নানা অভিমত পেয়েছি। প্রথম প্রকাশের সময় বইটিতে ছাত্রছাত্রীদের চিঠির অংশটির পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী ভূমিকা থাকা উচিত তা চিঠিতে উঠে আসা প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে বইটির মধ্যে ভাষা ও বানানের ক্ষেত্রে নানা সংশোধনী আনা হয়েছে। পাশাপাশি সময়ের অভিজ্ঞতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিঠির মধ্যে এবং চিঠির পরবর্তী অংশে সংযোজন করা হয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য যাঁরা কাজ করছেন, বইটি সেইসব সমাজকর্মীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করি। পলতা পি.এন.দাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় বইটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শিশুদের নিয়ে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা কাজ করছেন তাঁদের সকলকে জ্ঞাত করানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

নতুন সংস্করণের বইটি পাঠকবর্গের কাছে তুলে দিতে প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ঋণ স্বীকার করি।

২১শে জুন, ২০১০ লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বইটি প্রথম প্রকাশের পর সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে নানা গঠনমূলক পরামর্শ পেয়েছি। তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা এই পরিসরে সম্ভব হল না। তবু তাঁদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, বইটির প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম সংস্করণ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের লেখা চিঠির অংশটি এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কর্তব্যের অংশটি একই বইয়ের মধ্যে ছিল। পরবর্ত্তীকালে সুধী পাঠকবর্গের অনুরোধে ছাত্রছাত্রীদের চিঠি অংশটি আলাদা করে প্রথম খন্ড হিসাবে প্রকাশ করা হল এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কর্তব্যের অংশটি এক শিক্ষকের লেখা চিঠির আঙ্গিকেই দ্বিতীয় খন্ড হিসাবে আলাদা ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে এক শিক্ষক তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা আপামর শিক্ষক সমাজের কাছে এক চিঠির আঙ্গিকে নিবেদন করেছেন। ফলে 'মাস্টারমশাই সমীপেষু' বই দু'টি এখন দু'টি খন্ডে প্রকাশিত হল। দু'টি খন্ডের আবেদন পৃথক, কিন্তু মূল সুরটা একই। তবে একটি খন্ড থেকে আর একটি খন্ডে না পৌঁছলে বোধহয় সবটা পাওয়া যাবে না।

বই-টির অভ্যন্তরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস'- এর কর্মকর্তাদের ভালো লাগায়; তাঁরা তাঁদের পরিসরের কর্মীবর্গের এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে প্রচারের লক্ষ্যে প্রথম খন্ডটি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ লেখক

ভূমিকা

শিক্ষা অর্জনে শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি সহজাত (inherent) ক্ষমতা থাকে তবে শিক্ষকের মধ্যেও শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবার ক্ষমতা অর্ন্তনিহিত (dormant) আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনটা একদিকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (teaching learning process) অপর দিকে নৈমিত্তিক সামাজিক প্রক্রিয়ার (informal social process) মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধিত হয়। শেখার কাজটি শিক্ষার্থীর নিজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া নির্ভর। ঠিক যেমন গাছ নিজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠে। শিক্ষকের কাজ হল ধাপে ধাপে পাঠক্রমের পথ ধরে শিক্ষার্থীকে শিখতে সাহায্য করা। ঠিক যেমন মালি গাছকে পরিচর্যা করে। এটা বাহ্যিক সহায়তাদান প্রক্রিয়া।

শিক্ষকের মধ্যে যে অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা আছে সেটাকে তিনি যদি প্রয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তিনিই তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শেখানোর তাগিদে নতুন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং উন্নত শিক্ষা উপকরণের ডালি নিয়ে শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াতে পারেন। যেটা শিক্ষার বিস্তার এবং গুণগত মানকে অনেক দূর প্রসারিত করতে পারে। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সমাজে এই ইচ্ছাশক্তিরই বড় অভাব দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা গতি এবং তাড়না (impel) সৃষ্টি করে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রটিও এর বাইরে নেই। এখানেও শিক্ষার মান্নোয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক, মনস্তত্ব নির্ভর নানাবিধ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে তার প্রতিফলন কতখানি ঘটেছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেউ বলবেন, শ্রেণিকক্ষের যা সামগ্রিক পরিকাঠামো ও পরিবেশ সেখানে নতুন অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগের সুযোগ নেই। এখানেও সেই ইচ্ছাশক্তিরই অভাব।

একজন মানুষের নিজস্ব প্রেরণা (self inspiration) তাঁকে বহু বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এরকম অসংখ্য প্রমাণ মানবজীবনে আছে। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতার কাছে সেসবও আজ প্রেরণাহীন কাহিনী মাত্র।

আমাদের সমাজে একটা ভয়ংকর ভারসাম্যহীন অবস্থা বিরাজ করছে, এখানে কিছু মানুষ ভোগের প্রাচুর্যে আছেন আর অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে রয়েছেন। এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে কিছু শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ আছেন যাঁরা অসংখ্য গরিব শিশুর না শিখতে পারাকে, স্রেফ ভারসাম্যহীন সমাজের ফল হিসাবেই দেখছেন। শিক্ষার বিস্তার যদিও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, তবুও এটাই একমাত্র উপাদান ভাবলে সেটা হবে একটা মামুলি চিন্তা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাই শিক্ষার সংগে যুক্ত অনেকেই পোষণ করছেন। অথচ এই ভারসাম্যহীন সমাজে যেসব শিশু এবং যাঁদের শিশুরা ন্যূনতম শিক্ষাটুকুও অর্জন করতে পারল না, না পারার জন্য তাঁরা কাকে দায়ী করছেন সেটা অনেকেই ফিরে দেখার সাহস করছেন না। এটা ঘটলে হয়তো মামুলি চিন্তাভাবনার বদল

ঘটতো এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের ইতি কর্তব্যটা পুনর্নির্ধারিত হতো।

একথা উল্লেখ করতে হয় যে, এই সময়ের মধ্যে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, ধরে রাখা এবং তাদের সকলের শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেছে। কিন্তু তার সুফল যে সকল শিশুর কাছে সমানভাবে পৌঁছেছে তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতার ঘাটতি আছে একথাও বলা যাবে না। ঘাটতি যদি কোথাও থাকে তা শিক্ষকের অন্তরে। এই বইটিতে শিক্ষকদের কর্তব্য সম্বন্ধে কম বলে, বঞ্চিত শিশুদের জীবন যন্ত্রণাটা তুলে ধরে তাঁদের অন্তরের জায়গাটা নাড়া দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

এই বইটি লেখার কাজ যখন অনেকটাএগিয়ে গেছে তখন এক বরিষ্ঠ সহকর্মী আমার হাতে তুলে দিলেন "আপনাকে বলছি স্যার – বারবিয়ানাস্কুল থেকে'। বইটি পড়ে একই আঙ্গিক খুঁজে পাই এবং আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে ' মাস্টারমশাই সমীপেষু" লেখাটি শেষ করি।

বইটিতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া হতভাগ্য গরিব শিশুরা তাদের অব্যক্ত ব্যথা-যন্ত্রণা সমাজের সামনে উগরে দিয়েছে। এখন আমরা আমাদের মানবিক সত্ত্বা দিয়ে প্রকৃতার্থেই অসংখ্য বিদ্যালয় ছুট এবং ভর্তি না হতে পারা শিশুর যন্ত্রণাটা যদি উপলব্ধি করতে পারি তবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্নির্ধারিত হতে পারে।

তারিখ : ৫ই জুন, ২০০৬

মেচবাহার সেখ

গ্রন্থটি সম্পর্কে গুণীজনদের অভিমত

ভারতীয় সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে বর্তমান দশকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাঙ্খিত ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাঁদের কাছে প্রত্যাশাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের এক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব কী, সে সম্পর্কে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সেই মূল্যায়ন বুদ্ধিভিত্তিক অনুমান নয় – বাস্তব পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই করতে হবে। এই বাস্তবানুগ মূল্যায়নের একটি সার্থক প্রয়াস অনুজ প্রতীম মেচবাহার সেখের আলোচ্য গ্রন্থটির মধ্যে খুঁজে পেলাম। কেন শিশুরা বিদ্যালয় ছুট হয় – এ ব্যাপারে শিক্ষক – শিক্ষিকাদের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে – এই বিষয়গুলি অত্যন্ত নিপুণভাবে গল্প বলার আঙ্গিকে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং সমস্যার গভীরে পর্যবেক্ষণ করার সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে শিক্ষাতত্বের বিষয়গুলি এই রকম প্রাণবন্ত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ লেখার এই আকর্ষণীয় আদলটি পরবর্তীকালে নিশ্চয় পথ প্রদর্শক হবে।

মেচবাহার সেখের বাস্তব সমীক্ষা ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থটি অবশ্যই শিক্ষানুরাগীদের উপকারে লাগবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বশিক্ষা অভিযানে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তারিখ : ১২. ০৬. ২০০৬

শ্রী জ্যোতির্ভূষণ দত্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা

মেচবাহার শেখ লিখিত 'মাস্টারমশাই সমীপেষু' বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ ও শিক্ষিত হয়েছি। শিক্ষকেরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে তাঁদের সকলকে শিক্ষার মহৎ কাজে অনুপ্রেরিত করতে আমরা সমর্থ হইনি, অনেকেরই ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতা – আগ্রহের অভাব, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার সমস্যা আমাদের শিক্ষাদানকে দুর্বল করে তোলে। মেচবাহার তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মমতা দিয়ে গল্পের মতো করে ছাত্রদের চোখ দিয়ে শিক্ষকদের এই ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জীবন্ত এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এ বইটি আমাদের শিক্ষক সমাজের প্রত্যেকের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

পবিত্র সরকার

সমাজের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ও চেষ্টা থাকলেও তারা বিদ্যালয়ের মাঝ পথেই হারিয়ে যায় একটু সহানুভূতি ও ভালোবাসা না পাওয়ার জন্য। তাদের দুঃখ বেদনাবোধ মেচবাহার সেখ একদিকে যেমন সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন এই বইটিতে অপরদিকে তেমনি কতকগুলি শিক্ষাতত্ত্বের বিষয় যা প্রত্যেক অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের অবশ্যই জানা উচিত সেগুলিকে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাদান বা শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার কাজে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী কী হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি, তারও একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

সমাজের সকল অংশের শিশুরা (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়,ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে) অন্তত প্রারম্ভিক শিক্ষালাভ করলে দেশের ও জাতির উন্নতি সম্ভব এই বোধটুকু জাগিয়ে তুলতে এই বইটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তারিখ : ১৭.০৬.২০০৬

সনৎ কুমার ঘোষ
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
বিদ্যাসাগর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর

পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেছি। আজ ভাবতে খারাপ লাগে এবং মনে প্রশ্ন জাগে আমরা যাঁরা শিক্ষক হয়েছি, তারা রাধাকৃষ্ণান বা বুনো রামনাথের উত্তরাধিকার হওয়ার কতটা যোগ্য। আমরা হয় অর্থের পিছনে ছুটছি অথবা পড়াশুনো ত্যাগ করেছি।

লেখক বিদ্যালয়ছুট ছাত্রদের সংখ্যা কমনোর জন্য মাস্টার মশাইদের কাছে করুণ মিনতি জানিয়েছেন- ছাত্রদের ভালোবাসতে এবং তাদের মানবিক ও সহানুভূতির সাথে শিক্ষা দিতে। নতুন ও পরিবর্তিত সমাজে সমাজতাত্বিক ও হার্দিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষাদান প্রয়োজন। যদি শিক্ষক সমাজের একাংশের মধ্যেও এই দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা জাগে, তবেই লেখকের এই বইটি লেখার সার্থকতা প্রকাশ পাবে।

তারিখ : ৬/ ৬/ ২০০৯

তারকদাস মজুমদার
সহ-প্রধান শিক্ষক
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা

মাটি আর মনীষার মেলবন্ধন ঘটেছে মেচবাহার সেখের মেধাবী মননে। তারই প্রকাশ–

দ্রুত বদলে যাচ্ছে সব কিছু। মন, মনন, মতাদর্শ। প্লাস্টিক যুগ এখন। সব কিছুই ভেঙেচুরে যাচ্ছে। শিক্ষা পণ্য হচ্ছে – শিক্ষকও। 'মাস্টার মশাই' ধারণাটাই বিলুপ্ত হতে বসেছে। একদল শিক্ষা কিনতে চান আর একদল বেচতে। শিক্ষা নয়, ডিগ্রি-ই কাম্য। কেরিয়ারই সব কিছু, এমনকী রাজনীতিও।

এই সময় মাস্টার মশাই- দের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মেচবাহার সেখের লেখার প্রতিটি বাক্য ভাবায়। আমাকে ভাবিয়েছে, ভাবাচ্ছে, শেখাচ্ছে। আশা করি অন্যদেরও ভাবাবে, শেখাবেও।

ইমানুল হক
অধ্যাপক, বিধাননগর কলেজ
বিধাননগর

ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে প্রতিটি শিশুকে ন্যুনতম শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিগতকয়েক বছর ধরে বিভিন্ন রকমের আলোচনা ও লেখালিখি চলছে। শ্রী মেচবাহার শেখের লেখা "মাস্টারমশাই সমীপেষূ" এই পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক। শিক্ষা তথা শিক্ষককে শিশুর জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াই যথার্থ পথ – বইটির মূল বক্তব্য তাই। জীবন ও শিক্ষার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। এই অতি সাধারণ কথাটা আমাদের বিশেষ করে শিক্ষকদের চোখে পড়ে না। অথচ এই সহজ সত্যটি বুঝে নিলে শিশুকে শিক্ষাদান মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। শিক্ষাদানে শিক্ষকের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা। এই নতুন চিন্তাধারা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিপ্লব আনতে পারে। লেখক ছোট ছোট অনেকগুলি ঘটনার মালা গেঁথে আমাদের সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

তারিখ : ১৯.১.২০১০

অধ্যাপক ডি এস ভট্টাচার্য্য
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
রিজিওনেল ইনস্টিটিউট এডুকেশন,
এন,সি,ই,আর,টি, শিলং

মাস্টারমশাই সমীপেষু

মাননীয় স্যার,

আমাদের হয়তো এখন আপনাদের মনে পড়বে না। অবশ্য মনে পড়ার মতো ছেলেমেয়ে আমরা স্কুলে ছিলাম না। তবু আমাদের নামগুলো একবার বলি, আমরা হলাম – বাদল, ইসমাইল, পল্টু, বিনোদ, শম্পা, হাবলু এবং কানাই। আমরা সকলেই স্কুল ছেড়ে দেওয়া দল। আমাদের মতো বিদ্যালয়ছুটদের সবার নাম বলতে গেলে অনেক নাম হয়ে যাবে। তাই সবার নাম বলা গেল না।

আমাদের মুখগুলো না মনে পড়লেও আমাদের বাবাদের নাম বললে হয়তো আমাদের চিনিতে পারবেন। আমরা হলাম – শান্তি কোলে, সোলেমান মল্লিক, নগেন ক্ষেত্রপাল, পাঁচু হাঁসদা, নেপাল ঘটক এবং কান্তি বেসরার ছেলেমেয়ে। ক্ষেত খামারের নানা কাজে মুনিষ খাটার জন্য বাবাদের আপনারা ডাকেন বলে, ওদের আপনারা চেনেন। অবশ্য আমরা এখনো পুরোপুরি মুনিষ খাটার মতো হইনি। তাহলে হয়তো বাবাদের মতো আমাদেরও আপনারা চিনতে পারতেন।

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন বাড়িতে অভাবে-অবহেলায় কোনো রকমে শিখতাম। আবার স্কুলে গেলে আপনারাও মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন। ভাবতেন এদের দ্বারা কিছু হবে না। আপনা থেকে ঠেলেঠুলে যতটুকু হয় হোক্‌গে। অবশ্য হলোও তাই। আমরা কেউ তিন ক্লাসে ছেড়েছি। কেউ কোনো রকমে চার ক্লাসের দরজা পেরিয়েছি। কেউ তিন বছর আগে ছেড়েছি, কেউ চার বছর আগে ছেড়েছি। আমাদের মধ্যে আমি বাদল-ই শুধু টেনে হিঁচড়ে ছ'ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছেছি। তারপরই শেষ।

এখন আমাদের কারও ঠিকানা মাঠে গরুর পালের মাঝে, কারও ঠিকানা চায়ের দোকানে, কেউ হোটেলে, কেউ আবার বিড়ি কারখানায় ।

এখন আমরা অনেকটা বড় হয়েছি। আমরা প্রতিদিন সবার নিজের নিজের মনিবের কাজ সেরে রাত্রিবেলা কুবীর মোড়লের বৈঠকখানার চাতালে জড়ো হই। বাড়িতে সবার জায়গা হয় না। তাই একসাথে এখানেই রাত কাটাই। আবার সকাল হলেই নিজের নিজের মনিবের কাজে চলে যাই।

একদিন সন্ধ্যেবেলা পল্টুর মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বার হল। ও বললো – 'এখন তো সবাই স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। স্যারেদের সঙ্গে এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্কুলে থাকার সময় স্যারেদের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি, সেটা একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিই।' পল্টুর প্ল্যান মতো এই চিঠি লেখা।

স্কুল ছেড়ে আমরা এখন আমাদের গরু-ছাগলের মালিক, চা-দোকানের মালিক, হোটেলে নানা খদ্দেরের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। বড়দের সঙ্গে মিশে আর কানে পাঁচ কথা শুনে এই

বয়সে যা শেখার কথা ছিল না তাও শেখা হয়ে গেছে। যে খিস্তিগুলো আগে শিখিনি সেগুলো ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশে এখন শিখে ফেলেছি।এই বয়সে আমাদের কতসব জানা হয়েছে তা বলি শুনুন-

হোটেলের এককোনে পর্দা টেনে দিয়ে কলেজের ছেলেগুলোকে বিড়ি ফুঁকতে দেখেছি। মাঠে সারাদিন ষাঁড়ের সঙ্গে গাই গরুটার ভাব দেখেছি। আবার বিড়ি বাঁধার সময় পাশের বড়দিটাকে খক্ -খক্ করে কেশে মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে দেখেছি। স্কুলে ভর্তি থাকলে হয়তো এতসব দেখার সুযোগ হতো না স্যার।

স্যার, আমাদের মা-বাবারা আমাদের পড়াতে চেয়েছিল ঠিকিই। কিন্তু আমাদের পড়াশোনার ভালোমন্দ কী হচ্ছে, তা দেখার মতো বিদ্যে তাদের পেটে ছিল না। আমরা দল বেঁধে যখন স্কুলে যেতাম, তখন কারো কারো মা-বাবা অবশ্য বলতো – 'যা, বাবা যা, আমরা তো জীবনে স্কুলের দরজায় পা মাড়াতে পারিনি। তোরা যদি খানিকটা শিখতে পারিস তো দেখ'। মা-বাবাদের এই রকমই একটা আশা ছিল। কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের বিদ্যেটাই সবার কপালে জুটলো না। মাঝপথেই আমরা অনেকে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। স্কুল ছেড়ে আসার পর আমরা কে কোথায় থাকি তার হাজিরা এখন আর কেউ রাখে না।

আসলে স্যার, আমাদের বাড়িতে পড়াশোনাটা দেখিয়ে দেবার মতো তো কেউ ছিল-ই না, উল্টে মা- বাবারা যে যখন প্রয়োজন মনে করতো গরিবের সংসারে এটা - ওটা কাজে লাগিয়ে দিত। ফলে আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেও যদিওবা একটু-আধটু হতো, সে সুযোগটাও নষ্ট হয়ে যেতো। আবার স্কুলে গিয়ে দেখতাম – আপনারা সব সময়ই আপনাদের পছন্দের কিছু ছেলেমেয়েদের দিকে বেশি নজর দিতেন। আমাদের জীবনে কী হলো, কতটা শিখলাম, কোনটা শিখলাম না, এসব খোঁজ নেবার আগ্রহ আপনাদের দেখতাম না। ফলে লেখাপড়া শেখার জন্য বাড়ি আর স্কুল দুটোই আমাদের কাছে সমান ছিল। একটা জায়গাতেও যদি একটু ভরসা পেতাম তবে হয়তো আজ আমাদের এই হাল হতো না।

আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না – বুড়ো মানুষ রহমত স্যার একদিন ছিদাম স্যারকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন – 'ক্লাস থ্রি-র ছেলেমেয়েগুলো বেশিরভাগই কিছু শিখছে না, কী করা যায় বলুন তো?'

সেদিন ছিদাম স্যার রহমত স্যারকে মুখের উপর বলেছিলেন – 'ধুৎ মশাই, ক্লাসে একগাদা ছেলেমেয়ে, সবাইকে কি, ধরে ধরে শেখানো যায় না কি? যার হবার এমনিতেই হবে। আমরা শেখালেই বা কি, আর না শেখালেই বা কি। তাছাড়া মা-বাবারা ছেলে-পিলেদের দিকে নজর না দিলে, সব দায়ভার কী আমাদের না কি? ভগবান ওদের কপালে যা লিখেছে সেটাই হবে।'

ছিদাম স্যারের কথাটা শুনে বারান্দায় দাঁড়িয়া পল্টু সেদিন আমার পিছনে চুপিসারে একটা চিম্‌টি কেটে কানে কানে বলেছিল – 'বাদল রে, স্যারেদের কথা শুনলিতো। লেখাপড়া শেখাতে আমাদের পাশে মা-বাবাও নেই আর মাস্টাররাও নেই।'

কথাটা আমাকে বলেই পল্টু ছিদাম স্যারকে চুপিসারে একটা বাজে খিস্তি দিয়েছিল। সেটা আর এখন বলছি না। অবশ্য বললেই বা কি, ওরকম খিস্তি রাস্তাঘাটে এখন আপনাদের অনেকেই দিচ্ছে। অবশ্য পল্টুকে আমি বলেছিলাম – 'তুই স্যারকে গালাগালি দিয়ে অন্যায় করলি।'

উত্তরে পল্টু আমাকে বলেছিল – 'কেন গালাগালি দিলাম, সেটা শুনলি না। আমরা কি স্কুলে ফ্যালনা?'

স্যার, একদিন আমি আমাদের ঘরের দাওয়ায় বসে একটা বই থেকে রামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়ার গল্পটা পড়ছিলাম। আমি সে সময় ক্লাস থ্রি-তে পড়লেও ভালো করে রিডিং পড়তে পারতাম না। কোনো রকমে বানান করে পড়ছিলাম। বাবা সেই সময় উঠোনে গরুর জন্য খড় কাটছিল, আর আমার পড়াটা কান খাড়া করে শুনছিল। তারপর হঠাৎ দেখি বাবা রেগেমেগে চেঁচিয়ে মা-কে বললো – 'শুনছো, ছেলে পড়ছে দেখ। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে বনবাসে গিয়েছিল, এই কথাটা পড়তেই ওর দাঁত ভেঙে যাচ্ছে। আরে এসব কি পড়তে লাগে? রামযাত্রা দেখলেই বইয়ের পড়া মুখস্থ হয়ে যায়। কী আর বলবো – বংশে যাদের বিদ্যে নেই তাদের কি আর বিদ্যে হয়। এ যেন বুড়ো গরুর ল্যাজ ঠেলা হচ্ছে।' এই কথা বলতে না বলতেই বাবা উঠোন

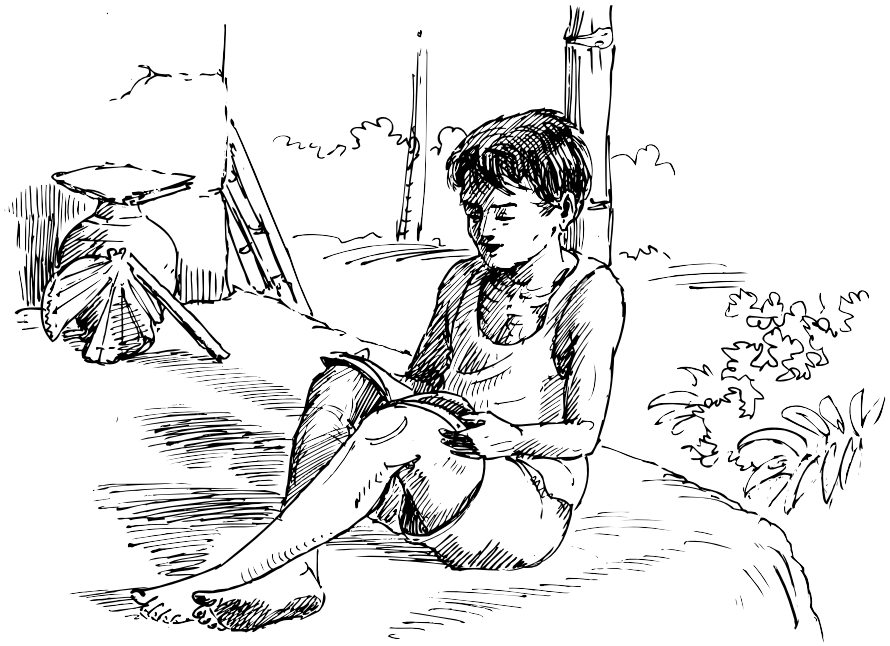

থেকে তেড়ে এসে, আমার মাথায় সজোরে মারল এক চাঁটি। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলো - 'শুয়োর কোথাকার, মাথায় কি গোবর ভরা আছে। খাচ্ছিস-দাচ্ছিস অথচ পড়ার বেলায় নেই।'

বাবার এই কান্ড দেখে মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে বাবাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বললো – 'ছেলেটাকে মারছো কেন? ওর কী দোষ? ছোটোলোকের বাচ্চা মাস্টারগুলো কি স্কুলে ভালো করে পড়ায়? পড়ালে দেখতে ও গড়গড় করে পড়তে পারতো। চোখে দেখতে পাওনা, আমাদের ছেলেমেয়েরা সংসারের হাজারো কাজে কেমন বুদ্ধি লাগিয়ে কাজ করে। আর পড়ার বেলায় বুদ্ধি খোলে না, তা কি হয়? দোষ মাস্টারগুলোর। ওদের কিছু বলার মুরোদ নেই, ঘরে বসে ছেলেটাকে ঠ্যাঙাচ্ছো।'

সেদিন বাবার হাতে মার খেয়ে চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়েছিল বইয়ের পাতায়। মনের দুঃখে মা সরস্বতীকে ডেকে বলেছিলাম, মা সরস্বতী আমাদের মতো গরিব ছেলেমেয়েদের কষ্টটা একটু বোঝ।

স্যার, আমরা যদি একটু গড়গড়িয়ে পড়ে দিতে পারতাম তাহলে আমাদের মা-বাবা-রা তা দেখে হয়তো ভাবতো যে, ছেলেমেয়েগুলোর পড়ায় বেশ ধার আছে। অনেকটা এগোবে মনে হচ্ছে। অন্তত এই ভরসায় মা-বাবাদের শতকষ্ট হলেও তারা আমাদের পড়ানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু স্যার, একটু ভালো রিডিং পড়েও মা-বাবাদের ভরসা দিতে পারিনি।

আসলে স্যার, আমাদের মতো পিছিয়েপড়াগুলো দৈনিক কোনোরকমে পড়া তৈরি করে নিয়ে গেলেও আপনারা দেখতেন না। আবার না করে নিয়ে গেলেও দেখতেন না। আমাদের কোন জায়গায় পড়ায় ভুল, কোন জায়গায় বোঝায় ভুল, কোন জায়গায় লেখায় ভুল, অঙ্কে কোন জায়গায় ভুল – এসব যদি একটু অন্তত ঠিকঠাক করে দিতেন তবে আমরা হয়তো এতটা পিছিয়ে পড়তাম না। আর এই পিছিয়ে পড়ার কারণেই আমাদের মা-বাবা-রা অনেকেই বুঝে নিয়েছিল – আমাদের দ্বারা বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়।

আপনারা স্যার, বড্ড একপেশে ছিলেন। শুধু স্কুলটা বুঝতেন আর ভালো ছেলেমেয়েগুলোকে বুঝতেন। না বুঝতেন আমাদের পরিবারগুলোকে, না বুঝতেন আমাদের। আমাদের লেখাপড়ার ভালোমন্দ নিয়ে যদি মাঝেমধ্যে আমাদের মা-বাবাদের সঙ্গে একটু আধটু কথা বলতেন তবে তারা আমাদের সুবিধে অসুবিধেগুলো হয়তো বুঝতে পারতো। নিরক্ষর হলেও জীবনের অভিজ্ঞতা তো ছিল। গরিব হলেও চেষ্টা তো করতো। তাতে শুধু তিন-চার ক্লাস নয়, হয়তো তার থেকে একটু বেশি এগোতে পারতাম। অন্তত আট ক্লাস। যেটা নিয়ে এখন চেঁচানো হচ্ছে বেশি।

আমাদের স্কুল জীবনের নানা ঘটনার কথা এবার এক এক করে বলি শুনুন –

শিক্ষকের কাজ শুধু বিদ্যালয়কেন্দ্রিক না হয়ে সমাজকেন্দ্রিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেউ মানুন আর নাই মানুন, শিক্ষকের কাজের পরিধি বিদ্যালয়ের বাইরে অভিভাবকস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগের একটা রাস্তা তৈরি হয়। এই রাস্তাই বিদ্যালয় এবং অভিভাবককে অনেক কাছে নিয়ে আসবে। শিক্ষা ভাবনাটা সমাজে পৌঁছাবার সুযোগ পাবে।

স্যার, আমাদের ঘরের পাশেই মনু হাজরাদের ঘর। তখন মনু আমাদের ক্লাসে সবার থেকে একটু ভালো পড়াশোনা করতে পারতো। মেয়ে বলে ও নিজেকে একটু আলাদা করে রাখতো।

মনুর বাবা চকের মোড়ে রিক্সা চালাতো।

একদিন রাত্রিবেলা শুনছিলাম মনুর বাবা মনুর মাকে ডেকে বলছে – 'শুন্‌ছিস, সকাল বেলা চকের মোড়ে রহমত মাস্টারের সঙ্গে দেখা হল।'

রহমত মাস্টারের নাম শুনে আমি বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে কানখাড়া করে বসেছিলাম। তারপর শুনলাম মনুর বাবা ওর মাকে বলছে – 'মাস্টার বললো, মেয়েটা পড়াশুনায় খুব ভালো। তা আমি ভাবছিনু - পড়াশোনা ছাড়িয়ে দেব। বেশি পড়ালেখা শেখালে বিয়ের সময় গরিব ঘরে পাত্র পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্ত এখন ভাবছি, মাস্টার যখন বললো পড়াশোনায় ভালো, তখন যতটুকু পারে পড়ুকগে।'

মনুর বাবার কথা শুনে, মনুর মা শুধু একটা কথা বললো – 'এ কথা তো আমি তোমাকে আগেই বলেছি। দেখো না – মেয়েটা যখন পড়ে, তখন শুনতে কত ভালো লাগে। আমরা লেখাপড়া না জানতে পারি। কিন্তু ওর পড়ার কথাগুলো শুনে তো বুঝতে পারি। সেদিন দেখলে না, ও পড়ছিল পুকুরের জল কীভাবে নোংরা হয়। ওর পড়া শুনে মনে হচ্ছিলো – পুকুরের নোংরা জলে আর থালা হাঁড়ি ধোব না। কাল সকালে পড়ছিল বাতাসে কী যেন একটা গ্যাস আছে, সেই গ্যাসটা না থাকলে আগুন জ্বলবে না। আমি জানতাম হাওয়া লাগলে আগুন নিভে যায়। অথচ বইয়ে লেখা আছে কী যেন একটা হাওয়া না থাকলেও আগুন জ্বলবে না। আমরা পড়তে না পারলেও ওর গুছিয়ে পড়াটা শুনেও মনটা ভরে যায়।'

মনুর মা-বাবার কথাগুলো শুনে আমার মনটা সেদিন দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল – আমিও যদি একটু ভালো করে পড়তে পারতাম, তাহলে এই কথাটা রহমত স্যার আমার বাবাকেও শোনাতে পারতেন। তাতে বাবা হয়তো একটু ভরসা পেতো। কিন্তু স্যার, বাবা-মা কে সেই ভরসা দেবার মতো আপনারা আমাদের তৈরি করেননি।

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাত্র ছাত্রীদের সামনে শুধু উগরে দিলেই শিক্ষকতা করা হয় না। বরং যে পাত্রে বিষয়বস্তু ঢালা হচ্ছে, সেই পাত্রের অবস্থাটা আগে বুঝতে হবে। মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়গুলি দেওয়ালে লাগানো আয়নার মতো মানুষের মুখে সাঁটানো আছে। তার দিকে চোখ ফেললেই বোঝা যাবে মানুষের মনের প্রতিচ্ছিবিটা।এটা না বুঝতে পারাটা এক ধরনের অক্ষমতা।

দুই

স্যার, আমরা ছিদাম স্যারের খারাপ ব্যবহারগুলো কোনো দিনই ভুলবো না। ছিদাম স্যারের এখন মনে আছে কিনা জানি না, একদিন ছিদাম স্যার ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, তখন আমাদের ক্লাসের বিনোদ ঝিম মেরে বসেছিল। ছিদাম স্যার পড়ানোর সময় হঠাৎ বিনোদকে একটা প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন শুনে বিনোদ প্রথমে থতোমতো খেয়ে গিয়েছিলো। প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেনি। উত্তর দিতে না পারায় ছিদাম স্যার তেড়ে এসে বিনোদের পিঠে সজোরে মেরেছিল এক ঝাপট।

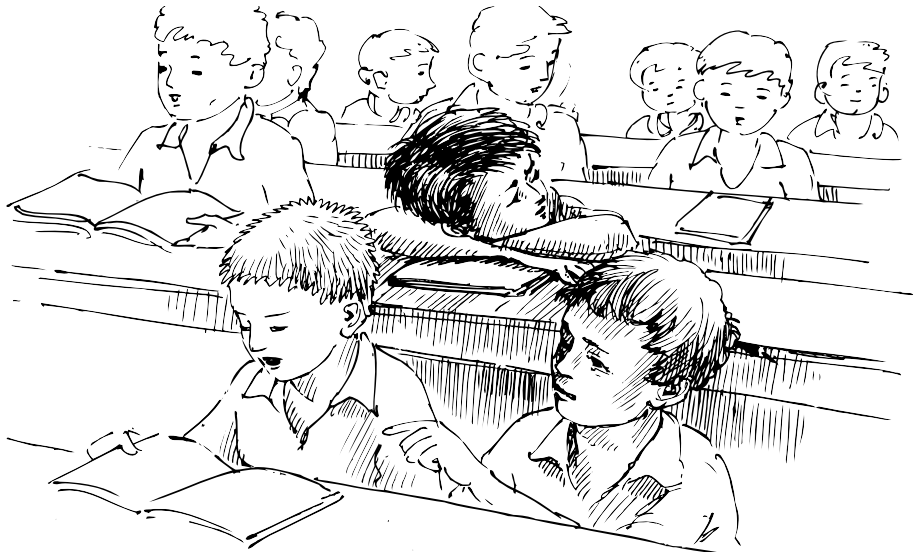

উঃ, কি বলবো স্যার! বিনোদ ছেলেটা একেবারে পিছনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দম আটকে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল। আমাদের সবার তখন দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। ভাবলাম, মরে যাবে নাকি! কিন্তু কোনো রকমে সামলে নিয়েছিল। আসলে গরিবের বাচ্চা তো, তাই সহ্য শক্তিটা অনেকটা বেশি ছিল। তারপর সারাক্ষণ বিনোদ মাথা নীচু করে ক্লাসের মধ্যে শুধু গুমরে কেঁদেই গিয়েছিল।

টিফিনের সময় আমরা সবাই বিনোদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম – 'তুইতো স্যারের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলি, তাহলে স্যারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলি না কেন?'

বিনোদ বললো – 'আমি স্যারের দিকে তাকিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মনে মনে অন্য কথা ভাবছিলাম।'

আমরা জিজ্ঞেসা করলাম – 'কী ভাবছিলি?'

বিনোদ বললো – 'স্কুলে আসার সময় মা আমাকে দুটো ভিজে ভাত দেবে বলে থালা ধুচ্ছিলো। তখন বাবা কোথা থেকে মদ খেয়ে এসে মা-র কাছে ভাত চাইলো।'

মা বললো – 'ভাত নেই। অল্প দুটো পান্তা ভাত আছে, ছেলেটা খেয়ে স্কুলে যাবে।' এই নিয়ে বাবার সঙ্গে মা-র কথা কাটাকাটি লেগে গেল। রাগের মাথায় বাবা কাস্তের বাঁট দিয়ে মা-র মাথায় মারলো। মা উঠানের মাঝে পড়ে গেল। পাড়ার লোক সব ছুটে এসে থামিয়ে দিল। মা-র মাথায় জল ঢাললো। সব থেমে যাবার পর আমি স্কুলে এলাম। ছিদাম স্যার যখন পড়াচ্ছিলেন, তখন আমি মনে মনে মা-র কথাটা ভাবছিলাম।'

আপনারা স্যার ক্লাসে আমাদের মুখটাকে দেখতেন। কিন্তু আমাদের মতো গরিব ছেলেমেয়েদের মনটাকে দেখতে পেতেন না। সে চোখ আপনাদের ছিল না।

স্যার, আমরা যখন মাঠে-ঘাটে, হোটেলে, চায়ের দোকানে কাজ করি তখন প্রতিদিন চোখের সামনে দিয়ে পাড়ার অনেক ছেলেমেয়েদের স্কুল যেতে দেখি। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবি- ঐ জীবনটা আর ফিরে পাব না। একথা ভেবে, মনে একটা গুমরাণি কষ্ট হয়। কিন্তু মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখতে হয়।

পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো অবশ্য যাবার সময় প্রথম প্রথম এক আধবার আমাদের ডাকতো, বলতো – 'কিরে, আজ যাবি না?'

ওদের কথা শুনে শুধু একবার 'না' বলে দিয়ে মনে মনে ভাবতাম –স্কুলে হাজিরা দিলে – তো কাজের জায়গায় গর হাজির হয়ে যাবো।

এখন যারা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে আমাদের গরিব পাড়ার অনেক ছেলেমেয়েও আছে। ওদের দেখি আর ভাবি – যাচ্ছিস যা, তবে কদিন-ই বা যাবি? গরিবের লেখাপড়া শেখা বড় কঠিন। কিছুদিন পরে আমাদের দলেই ভিড়তে হবে।

তিন

ইদানিং স্যার, একজন নতুন স্যারকে যেতে দেখি। না জানি উনি আবার কেমন! উনি স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রতিদিনই হাবলুর মালিকের চায়ের দোকানে একবার চা খেতে ঢোকেন। একদিন হাবলুর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'কিরে স্কুলে যাস না? কবে ছেড়ে দিয়েছিস?'

হাবলু একটু ভেবে বলেছিল– 'তা প্রায় তিন বছর হল।'

কথাটা শুনে নতুন স্যারটা বলেছিলেন– 'বা! বেশ ভালো করেছিস। তা– তোর বাবা কী করে?'

হাবলু সোজা সাপ্টা উত্তর– 'মাঠে মুনিষ খাটে।'

'আর, মা কী করে?'

'মা লোকের বাড়ি কাজ করে।'

তারপর নতুন স্যারটা জিজ্ঞেস করেছিলেন – 'এখানে কত টাকা মজুরি পাস?'

এই কথা জিজ্ঞেস করা শুনেই দোকানের মালিক বসার পাটা থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে নেমে এসে হাবলুকে এক চাঁটি মেরে গলা ধাক্কা দিয়ে দোকানে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছিল – 'যা শুয়োর, এঁটো কাপগুলো তাড়াতাড়ি ধো। দেখছিস না, খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে।'

এই কান্ড করেই হাবলুর মালিক নতুন স্যারটাকে বলতে শুরু করেছিল – 'আর বলবেন না স্যার, এইটুকু পুচকে ছেলে হলে কী হবে। ব্যাটা মহা বদমাইশ আর ফাঁকিবাজ। স্কুলে তো পড়াশোনা করতোই না, আবার স্কুল যাবার নাম করে এখানে ওখানে খেলে বেড়াতো। ওর এই বদমাইশি দেখে, ওর মা আমার দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলো।'

আশ্চর্যের কথা স্যার, দোকানের মালিকের দাপটে হাবলুর জীবনের আসল সত্যটা চাপা পড়ে গেল। দোকানদার ভালো হয়ে গেল। মা-বাবারাও ভালো হয়ে গেল। শুধু দোষী হয়ে গেল দশ বছরের ছেলেটা।

হাবলু আমাদের বললো – 'জানিস, এই নতুন স্যারটা চা খেতে এসে দোকানে বসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আশপাশের লোকেদের সঙ্গে শুধু পার্টির কথাই বলে। মনে হয় লোকটা পার্টি করেই চাকরিটা পেয়েছে।' কি জানি, এই স্যারটা ক্লাসে আবার ছিদাম স্যারের মতো, না কি রহমত স্যারের মতো। কারণ আপনারা সব স্যারেরাই একদিকে ছিলেন। শুধু রহমত স্যারই আমাদের কথা একটু ভাবতেন। তাই আপনারা ওনাকে পছন্দ করতেন না।

হাবলু একদিন মনুকে ওদের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে স্কুল থেকে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করেছিল – 'মনু, নতুন স্যারটা কেমন রে?'

মনুর উত্তর দেবার আগেই ওর বন্ধু কাজল বলেছিল – 'আর বলিস না, ক্লাসে অন্য স্যারেদের সঙ্গে সারাক্ষণ খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পার্টির আলোচনা করে। আজ গ্রামে কী হলো। কাল কখন মিছিল করতে হবে, কবে কিসের চাঁদা তুলতে হবে। সারাক্ষণ এইসব করতেই ব্যস্ত। আমাদের পড়ায়, লেখায় কোথায় কি ভুল হল, তা নিয়ে নতুন স্যারের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। কোনোদিন বোর্ডে চক ঠেকালো না। শুধু বলেন – পড়, পড়া দে। আর বাড়ি থেকে পড়ে আসবি।'

চার

স্যার, এবার একটু অন্য কথায় আসি। স্কুলে আমরা কীভাবে পড়তাম, লিখতাম, অঙ্ক করতাম এবং পড়ায়, লেখায়, অঙ্কে আমাদের কোথায় কী ভুল হতো সেগুলো এবার বলি। স্কুলে থাকার সময় আমাদের ভুলগুলো সংশোধন না হওয়ায় দিনে দিনে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

পাড়া থেকে এখন যেসব নতুন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে ওদের জীবনে যদি একই ঘটনা ঘটে, তবে ওদের অবস্থাও আমাদের মতো হবে। তাই স্কুলে থাকার সময়ে আমাদের কষ্টগুলো আপনাদের শোনাচ্ছি। যাতে ওরা আপনাদের কাছে আমাদের মতো আর কষ্ট না পায়।

আমাদের পড়ার অভ্যাসগুলো এবার বলি- আমরা কেউ 'র' কে 'ব' –এ শুন্য'র' বলতাম। 'দ' কে হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' বলতাম। 'ধ' কে কাঁধে পুটলি 'ধ' বলতাম।

একবার আমাদের স্কুলে নবীন বলে একটা ছেলে ভর্তি হল। ওর বাবা কোচবিহার থেকে আমাদের এলাকায় সরকারি চাকরি করতে বদলি হয়ে এসেছিলেন। বাবা-মা-র সঙ্গে নবীনও চলে এসেছিল এবং আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। নবীন 'আ'কে 'সরে আ' বলতো।

অক্ষরগুলোর এইসব নানারকম নাম আমরা কেউ কেউ মা-বাবার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু বেশির ভাগটাই আপনাদের কাছে শিখেছিলাম। অক্ষরগুলো এইসব মজার নাম দিয়ে পড়তে বেশ মজা লাগতো। আমরা কোনো বন্ধুর কাঁধে ব্যাগ দেখলে তাকে কাঁধে পুঁটলি 'ধ' বলে রাগাতাম।

স্যার, অক্ষরগুলোর আসল নামের সঙ্গে নকল নামটার মজা থাকলেও যখন আমরা দু-তিনটি অক্ষরকে একসঙ্গে জুড়ে পড়তাম তখনই আমাদের পড়াশুনায় নানা গোলমাল লেগে যেতো। আপনারা যখন 'ধর' কথাটা উচ্চারণ করাতেন-কাঁধে পুটলি 'ধ'-'ব' এ শুন্য 'র' বলে। তখন 'ধর' কথাটা চট করে মুখে আসতে চাইতো না। মনে হত- কাঁধে পুটলি 'ধ'-ব এ শুন্য 'র' কে- 'কাঁধবর' বলি। আপনারা উচ্চারণ করাতেন –ক ড এ শুন্য ই কার -'কড়ি'। 'কড়ি' কথাটা চট করে উচ্চারণ করতে মন সায় দিত না। মনে হতো ক-ড এ শুন্য 'ই' কার 'কডড়ি' বলি।

নবীনকে একদিন 'আমরা' কথাটা পড়তে দেখলাম – সরে আ ম ব এ শুন্য র এ কার বলে। বানানটা করার পর নবীন বার বার 'সরে আম সরে আম' করে শেষে বলছে 'সরে আম বরা'।

আমরা যখন একটু একটু করে অক্ষর চিনে রিডিং পড়তে শিখলাম, তখন আমাদের এক একজনের এক এক রকম পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বিনোদ পড়ত ব-ন এ-কার থ - এ আকার ব - এ – আকার – ঘ। বিনোদ গোটাটাই এই রকম বানান করে পড়তো। এক একটা কথাকে বানান করে তারপর আলাদা করে বিনোদ আর কথাটা উচ্চারণ করতো না।

আবার শম্পা পড়তো-ব-ন এ একার 'বনে' থ – এ আকার ক একার 'থাকে' – এই রকম ভাবে। শম্পা বানান করতো তারপর কথাটা আলাদা করে বলতো। কিন্তু সব কথাগুলো মিলিয়ে গোটা বাক্যটা আর বলতো না।

আবার পল্টুর পড়ার অভ্যাস ছিল অন্য রকমের। পল্টু আগে 'বনে' কথাটা বানান করতো। তারপর 'বনে' কথাটা বলতো। এই রকমভাবে 'বনে থাকে বাঘ' সব কথাগুলো প্রথমে একটা একটা করে উচ্চারণ করতো তারপর শেষে পুরো কথাটা বলতো – 'বনে থাকে বাঘ'।

আমদের কেউ টানা রিডিং পড়তে পারতো না। এক একজনের এক এক রকম পড়ার অভ্যাস ছিল। সবমিলিয়ে আমাদের একটা জগাখিচুড়ি মার্কা পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

পড়তে আমাদের কষ্ট হতো। কিন্তু সেই সময় আমরা আমাদের ভুলটা ধরতে পারতাম না। মনে কষ্ট হলেও আপনাদের কাছে কিংবা বাড়িতে কোথাও একটু সাহায্য পেতাম না। ফলে এইসব জগাখিচুড়ি মার্কা পড়ার অভ্যাস নিয়ে কোনো রকমে তিন-চার ক্লাস পর্যন্ত এগোলাম। তারপর আমাদের পড়ার হাল দেখে বাবা-মা-রাও হতাশ হলো। আমরাও ভেবেছিলাম এভাবে বেশি দূর এগনো যাবে না। ফলে এই আধখ্যাঁচড়া পড়া শিখে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

এখন আমাদের কারও হাতে পাঁচন, কারও হাতে এঁটো কাপ, কারো হাতে বিড়ি বাধার সুতো, কাঁচি এইসব। এখন আধখ্যাঁচড়া শেখাটাও মনে আছে কিনা তা ফিরে দেখার সময় পাই না।

স্যার, আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের রিডিং পড়ার এক কেচ্ছার কথা আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। তবু ঘটনাটা বলি – আমাদের ক্লাস থ্রি–তে বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে ভালো রিডিং পড়তে পারতো। আমাদের যেমন রিডিং পড়তে আটকে যেতো, বানান করে পড়ার অভ্যাস ছিল, কিন্তু ভালো ছেলেমেয়েগুলোর তা ছিল না। ওরা বেশ গড়গড়িয়ে পড়তে পারতো। আমরা মাঝে মধ্যে দেখতাম ওদের মধ্যে রিডিং পড়ার বেশ রেষারেষি চলতো।

একবার আমাদের স্কুল কমিটির সেক্রেটারি স্কুল দেখতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের ক্লাসে এসে সামনের বেঞ্চে বসা পরিমলকে একটা গল্পের বই থেকে রিডিং পড়তে বললেন। পরিমল খুব তাড়াতাড়ি রিডিং পড়ে সেক্রেটারির মন জয় করার চেষ্টা করছিল। পরিমলের খানিকটা

রিডিং পড়ার পর সেক্রেটারি হঠাৎ পরিমলকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- 'যা পড়লে তার থেকে কী বুঝলে - বল।' পরিমল প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কী একটা বলতে চেষ্টা করেছিল। পরিমল বলতে পারছে না দেখে সেক্রাটারি মনে মনে রেগে গিয়েছিলেন।

আমাদের ক্লাসে মনু ভালো রিডিং পড়তে পারতো। মনু চট্ করে দাঁড়িয়ে বললো, 'স্যার আমি বলবো?'

সেক্রেটারি বললেন – 'তুমি তো পড়নি, তুমি কী করে বলবে?'

মনু বললো – 'আমি পড়িনি ঠিকই, কিন্তু পরিমল যখন পড়ছিল তখন মন দিয়ে পরিমলের পড়াটা শুনছিলাম। তাই যা শুনেছি তা মোটামুটি বলতে পারব।'

সেক্রেটারি মনুকে বলতে বললেন।

মনুর বলা শুনে সেক্রেটারি খুশি হয়েছিলেন। সেই সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছিদাম স্যারকে সেক্রেটারি বলেছিলেন – 'ছেলেমেয়েরা রিডিং পড়ছে ভালো। অথচ যা পড়ছে তা বলতে পারছে না কেন? এ দিকটা একটু দেখুন।'

ছিদাম স্যার হাত কচলাতে কচলাতে বলেছিলেন – 'তাই তো দেখছি। আচ্ছা দেখি কী করা যায়।'

সেক্রেটারি চলে যাবার পর ছিদাম স্যার আবার আমাদের ক্লাসে এসেছিলেন। তারপর পড়ানোর তোয়াক্কা না করে প্রথমেই পরিমলকে ডেকে বললেন – 'হারামজাদা, তুই পড়লি ভালো, অথচ সোজা কথাটার গুছিয়ে উত্তর দিতে পারলি না। তুই আমার মুখ ডুবালি।' এই কথা বলেই দমাদম পরিমলের পিঠে ঘা কতক ধরিয়ে দিলেন।পরিমলের অসুবিধেটা কোথায় সেটা জানার তোয়াক্কা করলেন না।

কি বলবো স্যার, সেদিন ছিদাম স্যার অন্যায়ভাবে পরিমল ছেলেটাকে পিটিয়েছিলেন।

পরিমলকে অবশ্য পরে আমরা জিজ্ঞেসা করেছিলাম – 'তুই রিডিংটা পড়লি ভালো, অথচ যা পড়লি তা বলতে পারলি না কেন?'

পরিমল বললো – 'আসলে আমি ভালো রিডিং পড়ে ক্লাসের সবার মান রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। পড়ার সময় আমার মনটা শুধু রিডিংটা যাতে ভালো হয় সেই দিকেই ছিল। পড়ার মানেটার দিকে খেয়াল ছিল না।'

ছিদাম স্যারটা আগাগোড়াই বদমেজাজি লোক ছিলেন। পরিমলের ভুলটা না দেখিয়ে দিয়ে ক্লাসে এসেই শুধু ওকে পেটাতে শুরু করলেন। অবশ্য পরিমলের পড়াটা শুনে আমারও মনে হচ্ছিল ও যেন রেলগাড়ির মতো ছুটছে। কোনো থামাথামির ব্যাপার নেই।

ছয়

পড়া নিয়ে আমাদের জীবনের আর কত যন্ত্রণার কথা বলব স্যার! এসব দুঃখ বলে শেষ করা যাবে না। তবু পড়া নিয়ে আমাদের ক্লাসের আর একটা ঘটনার কথা বলি। এটা হয়তো আপনাদের আজও মনে আছে। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে , নামটা এখন মনে পড়ছে না, দক্ষিণপাড়া থেকে আসতো। মেয়েটাকে পড়া ধরলে খুব তাড়াতাড়ি রিডিং পড়ে দিতো।

একদিন দেখলাম হঠাৎ দুপুর বেলা স্কুলের ভিতরের মাঠে একটা সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক নামলেন। আপনারা তখন ভদ্রলোককে নামতে দেখে কেমন যেন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন। নন্দি স্যার আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে ভদ্রলোককে দেখেই ছিদাম স্যার কে চেঁচিয়ে বললেন – ‘ছিদামবাবু, চেয়ারম্যান সাহেব এসেছেন।’ ছিদাম স্যার আমাদের ক্লাসের একদিকে চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছিলেন। নন্দি স্যারের আওয়াজ শুনে ছিদাম স্যার ধড়মড়িয়ে উঠে আমাদের সবাইকে বললেন – ‘এই, সবাই জোরে জোরে পড়।’ ছিদামবাবুর ভয়ে আমাদের হাতের কাছে যার যা বই ছিল তাই নিয়ে সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম।

চেয়ারম্যান সাহেব প্রথমে আমাদের থ্রি-র ঘরে ঢুকেছিলেন। তারপর হঠাৎ যে মেয়েটা গড়গড়িয়ে রিডিং পড়তে পারতো, তাকেই কাছে ডেকে নিয়ে বাংলা বই থেকে রিডিং পড়তে বললেন। বলা মাত্র মেয়েটা গড়গড়িয়ে বইয়ের পাতায় আঙুল দিয়ে রিডিং পড়তে শুরু করলো। সে যখন পড়ছিল তখন দেখছিলাম চেয়ারম্যান সাহেবের কপালের চামড়াটা কেমন যেন কুঁচকে যাচ্ছিল। তারপর দেখলাম হঠাৎ চেয়ারম্যান সাহেব মেয়েটার বইটা হাতে নিয়ে বইয়ের মাঝামাঝি পাতা থেকে নতুন গল্প পড়তে দিলেন। ব্যাস, আর যায় কোথা, মেয়েটা আর একটা লাইনও পড়তে পারল না। চেয়ারম্যান সাহেব মেয়েটার পড়ার ভুলটা ধরে নন্দি স্যারকে কি যেন দেখাতে লাগলেন। নন্দি স্যারকে দেখলাম – শুধু হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার করতে ব্যস্ত। আপনাদের অবস্থা দেখে আমাদের সেদিন যে কি হাসি পাচ্ছিল তা আর কি বলবো স্যার। পল্টু কাছাকাছি বসা আমাদের সবাইকে কানে কানে বললো – ‘বুঝলি, এই চেয়ারম্যান সাহেব মনে হয় আমাদের স্যারেদের ওপরওয়ালা।’ এরপর চেয়ারম্যান ভদ্রলোক ক্লাস টু-তে ছিদাম স্যারের ঘরে গেলেন। উঃ! সেদিন ছিদাম স্যারের যে কি করুণ অবস্থা তা কী বলবো স্যার!

চেয়ারম্যান ভদ্রলোক ক্লাস টু-তে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন – ‘তোমরা এখন কী বই পড়ছো?’

ছেলেমেয়েগুলো কেউ বললো – বাংলা, কেউ বললো অঙ্ক। এই কথা শুনে চেয়ারম্যান সাহেব ছিদাম স্যারের দিকে তাকাতেই ছিদাম স্যার কী যেন একটা বোঝাতে চাইছিলেন। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ছিদাম স্যারের কথায় কান না দিয়ে ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন ‘তোমরা কেউ বাংলা আবার কেউ অঙ্ক করছো কেন?’ এইকথা শুনে সরল মনে একটা ছেলে বলে উঠলো – ‘স্যার,এখন অঙ্কের ক্লাস তাই আমরা অঙ্ক করছিলাম, তখন ছিদাম স্যার ঘুমোচ্ছিলেন। আপনি যখন গাড়ি থেকে নামলেন তখন ছিদাম স্যার আপনাকে দেখে আমাদের বললেন – সবাই

জোরে জোরে পড়। তাই আমরা অঙ্ক বাদ দিয়ে বাংলা পড়ছি।'

ছেলেটার বলা শেষ হতেই উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে বলে উঠলো – 'স্যার, এখন বাংলা ক্লাস নয়, তাই আমি অঙ্ক করছিলাম।'

ছেলেমেয়েদের এই রকম কথা শুনেই চেয়ারম্যান সাহেব রেগেমেগে,গট্ গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল তা আমরা টের পায়নি। তবে পরে দেখেছিলাম চেয়ারম্যান ভদ্রলোক চলে যাবার পর রহমত স্যারের সঙ্গে আপনাদের বেশ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। আপনাদের ঝগড়া দেখে স্কুলের সামনের চায়ের দোকানের খদ্দেরগুলো স্কুলের বাইরের জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে আপনাদের ঝগড়া দেখেছিল।

আর সেদিন সন্ধ্যে বেলা আমি যখন বাড়িতে পড়ছি, তখন বাবা চকের মোড়ের বাজার থেকে ফিরে এসে আমাকে বললো – 'আমি বাজারে শুনছিলাম তোদের স্যারেরা নাকি আজ স্কুলে মারামারি করেছে?'

দেখুন কান্ড স্যার, আপনারা স্কুলে ঝগড়া করলেন, আর স্কুলের বাইরে চারদিকে রটে গেল আপনারা মারামারি করেছেন।

সাত

স্যার আমাদের ক্লাসের নগেনের রিডিং পড়ায় একটা বাজে অভ্যাস জন্মে গিয়েছিল। নগেন মনে মনে বানান করে মুখে শব্দটা উচ্চারণ করতো। মুখে শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নগেন পরের শব্দটাও মনে মনে বানান করতো। মনে মনে পরের শব্দটা বানান করার সময় আগের শব্দটা মুখ দিয়ে আপন মনে দু-তিনবার উচ্চারণ করতেই থাকতো। কিন্তু পরের নতুন শব্দটা যেই মুখে উচ্চারণের জায়গায় চলে আসতো তখন আগের শব্দটা ছেড়ে দিয়ে নতুন শব্দটাকে একইভাবে উচ্চারণ করতেই থাকতো।

নগেনের পড়া নিয়ে আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে নগেনকে তোতলা বলতাম। আসলে নগেন তোতলা ছিল না।

ছিদাম স্যারের এখন মনে আছে কিনা জানি না – তিনি একদিন রসিকতা করে হাতের পাঁচ আঙুল সোজা করে নগেনের পেটে সোজাসুজি খোঁচা মেরে বলেছিলেন – 'তোর পেটে তো

শিশুকে শিশু ভেবে খাটো করে দেখাটা বোকামির পরিচয়। কারণ শিশু তার গড়ে ওঠা বোধশক্তি দিয়ে তার মতো করে পরিবার, পরিবেশ, মানুষ ও সমাজকে বুঝতে পারে। সে নিজের চোখে যা দেখে সেটাকে তার মতো করে একটা অর্থ দাঁড় করায়। তার সে বোঝায় অস্পষ্টতা থাকতে পারে। কিন্তু কোন ফাঁকি থাকে না। শিশুর সরলতা থাকবেই। কারণ তার মধ্যে গরল ঢোকে নি। তাই তার প্রকাশের ক্ষেত্রেও সরলতার প্রতিচ্ছবি থাকবে।

পড়াগুলো জমে আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বার হচ্ছে না, মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে, নে, এবার আমি খোঁচা দিচ্ছি, তুই তাড়াতাড়ি পড়াগুলো পেট থেকে বার কর।' সেদিন বার তিনেক খোঁচা খেয়ে নগেন দম আটকে বেঞ্চে মাথা হেঁট করে বসে পড়েছিল। তখন ছিদাম স্যার ছুটোছুটি করে জল এনে ওকে অবশ্য বাঁচানোরও চেষ্টা করেছিলেন। আর সে যাত্রায় নগেন বেঁচে গিয়েছিল। মরে গেলে ছিদাম স্যারের কী হতো তা জানি না। তবে নগেনের বাবা-মা সন্তানহারা হয়ে যেতো।

আমরা কেন পড়তে পারতাম না, এটা নিয়ে ছিদাম স্যার ভাবেননি। সেটা যদি ভেবে আমাদের ভুলগুলি ধরিয়ে দিতেন তবে হয়তো এই অত্যাচারগুলো আমাদের সহ্য করতে হতো না।

আট

স্যার, ইসমাইলকে আপনাদের নিশ্চিত মনে পড়বে। পশ্চিমপাড়ার সোলেমান মল্লিকের ছেলে। বিনা কারণে ছেলেটাকে পিটিয়ে ছিলেন বলে, সে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

সেটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এর জন্য অবশ্য এলাকায় বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটা হয়তো আপনাদের মনে পড়বে। সেদিন আমরা টিফিনের সময় সব ছেলেরা মিলে স্কুলের সামনের মাঠে ক্রিক্রেট খেলছিলাম। ক্রিকেটের উইকেট বলতে চারটে বাঁশের কঞ্চি,

আর বল ছিল রাবারের। ব্যাট বলতে একটা ভাঙা কাঠের পাটা। ওটাই পল্টু কাটারি দিয়ে কেটে ব্যাট বানিয়ে এনেছিল। খেলার সময় আমাদের ক্রিকেট বলটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে স্কুলের

পিছনে পড়েছিল। ইসমাইল দৌড়ে গিয়ে স্কুলের পিছন থেকে বলটা কুড়িয়ে আনলো। তারপর আমরা খেলে শুরু করলাম। ঠিক দুঁ- তিন মিনিটের মাথায় হঠাৎ আপনারা ইসমাইলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম ইসমাইল ক্লাসের ভিতরে মা-গো, বাবা-গো বলে চিৎকার করছে। আমরা খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে বাইরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি – ছিদাম স্যার ইসমাইলের চুলের মুঠি ধরে এলোপাতাড়ি পেটাচ্ছেন। আর আবোল - তাবোল খিস্তি দিচ্ছেন। পেটানির চোটে দেখলাম – ইসমাইল যখন নেতিয়ে পড়েছে আর শুধু হেঁচকি তুলছে, তখন ছিদাম স্যার শেষে ইসমাইলকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ক্লাস থেকে বার করে দিয়ে বললেন – 'বার হয়ে যা স্কুল থেকে, তোর মতো ছেলে আমাদের স্কুলে আর দরকার নেই। কাল থেকে এই স্কুল মুখো হবি না।'

ছিদাম স্যারের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ইসমাইল নিজের জামাটা টেনে সোজা করে কোনো রকমে চোখের জল মুছতে মুছতে ক্লাস থেকে বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। স্কুলের গেটের কাছে যেতেই আমরা সবাই ওকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম – 'তুই তো আমাদের সঙ্গে খেলা করছিলি, হঠাৎ স্যার তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারলো কেন?'
ইসমাইল মাথা হেঁট করে বলেছিল – 'কিছু না। এমনিই স্যার মারলো।'
আমরা বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে তখন ইসমাইলের চারপাশে জড়ো হয়ে গেছি।

আমরা সবাই মিলে যখন বার বার ইসমাইলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম তখন ইসমাইল অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বললো – 'আমি যখন ক্রিকেট বলটা কুড়িয়ে আনতে স্কুলের পিছনে গিয়েছিলাম তখন দেখি শ্যামলী' – বলেই ইসমাইল একটু থেমে গেল।

আমরা বুঝলাম ও কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু মেয়েদের সামনে হয়তো বলতে পারছে না। আমরা তৎক্ষণাৎ মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে ওকে আবার বলতে বললাম।

তখন ইসমাইল বললো – 'ক্রিকেট বলটা কুড়িয়ে আনতে গিয়ে দেখি শ্যামলী স্কুলের পিছনে বাথরুম, না অন্য কী যেন একটা করছিল। আমি ওকে দেখে একটু হেসে ফেলেছিলাম। ছিদাম স্যার তাই আমাকে ডেকে মারলো।' একথা বলেই ইসমাইল স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল।

আর যাবার সময় শুধু বলে গেল – 'আর কোনোদিন স্কুলে আসবো না।'
ইসমাইল চলে গিয়েছিল স্যার। ইসমাইলের পড়ার স্বপ্নটা ছিদাম স্যার একাই শেষ করে দিয়েছিলেন। সেদিন স্যার আমরা ইসমাইলের অন্যায়টা যে কী ছিল তা বুঝতে পারিনি।

বিদ্যালয়ে বাথরুম না থাকার ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের যে অভ্যাস তৈরি হয় সেটা একটা অনুন্নত সমাজের সূচক। শিক্ষা ব্যাপারটা শুধু পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি ট্যাবলেটের মতো গিলে খাওয়া নয়। শিক্ষা মানে- প্রকৃত মানুষ হওয়া। বর্তমানে একাংশের মানুষের মধ্যে ভাল রেজাল্টের জন্য প্রতিযোগিতা বেড়েছে। শিক্ষার প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতা নেই। শিক্ষার সামাজিক দিকটা পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ না থাকলেও সেটা শিক্ষকের মধ্যে আছে। যেটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চালিত হলে সমাজ বদলের সূত্রপাত হয়।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম শ্যামলী মেয়েটা স্যারেদের কাছে ইসমাইলের নামে কিছু একটা নালিশ করেছিল। তার জন্যই ইসমাইলকে চরম শাস্তি পেতে হয়েছিল। শ্যামলী ছিল আমাদের স্কুলের মধ্যে সব থেকে বড়ো মেয়ে। দু'বছর আগে ক্লাস ফোরে পড়া ছেড়ে দিয়ে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে স্কুলে আবার ভর্তি হয়েছিল। শ্যামলী আপনাদের কী বলেছিল তা আমরা জানতে পারিনি স্যার। তাছাড়া ওটা আমাদের জানার কথাও না। তবে ইসমাইলের দোষটাই বা যে কী ছিল, তাও আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি।

আমাদের মধ্যে পল্টু সবার থেকে বড় ছিল। সেদিন ঘটনার পর পল্টু শুধু একটা কথা বলেছিল – 'স্কুলে একটা বাথরুম থাকলে আর এই ঝামেলাটা হতো না। স্যারেরা একটা বাথরুম করার চেষ্টা করলো না। নিজেরাও দেওয়ালের পাশে গিয়ে যা করে, আমাদেরও তাই করতে হয়। আমাদের সবার গরু ছাগলের মতো অভ্যাস থেকে গেল।'

সেদিনের এই ঘটনার পর ইসমাইল আর স্কুলে আসেনি স্যার। কিছুদিন পর তাকে দেখলাম, ওর বাবার মাংসের দোকানে বসছে। এখন ইসমাইল ওখানেই ডেলি হাজিরা দেয়। ওর হাজিরার ঝামেলা আপনাদের আর পোয়াতে হয় না।

সেদিন ইসমাইলকে মারধোর করা দেখে আমরা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য রহমত স্যারের সঙ্গে আপনাদের এই নিয়ে চরম বচসা হয়েছিল। দরজা জানালা দিয়ে আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে আপনাদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলতে দেখেছিলাম। রহমত স্যারকে দেখেছিলাম ছিদাম স্যারের দিকে তাকিয়ে জোরের সঙ্গে বলছিলেন – 'ছেলেমেয়েদের শুধু মারধোর করেই সহবত শেখানো যায় না। ভালোবেসে শেখাতে হয়। ইসমাইল একটা বাচ্চা ছেলে। ওর মধ্যে কোনো কু-মতলব থাকতে পারে না।' এই কথা শুনে ছিদাম স্যার রহমত স্যারকে চিৎকার বলে উঠেছিলেন – 'আপনার দেখছি পশ্চিমপাড়ার ছেলেমেয়েদের দিকে বেশি টান।'

ছিদাম স্যারের কথা শুনে রহমত স্যারও চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন – 'আমার কাছে পূর্ব-পশ্চিম সবই সমান। কারণ আমি শিক্ষক, আমি পিতা। শাস্ত্রটা আর একবার ভালো করে পড়ে নেবেন। আপনার মনটাই পেঁচানো। পারলে একবার গঙ্গা জলে ধুয়েও আসবেন।'

আপনাদের মধ্যে আর কী বচসা হয়েছিল তা জানি না স্যার। তবে পরের দিন দেখলাম শ্যামলীও আর স্কুলে আসেনি। তারপর থেকে আর কোনো দিনই না।

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের নানা উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পরিবেশ। আমরা সবাই চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখুক এবং শেখার মতই শিখুক। আর এ জন্যই তাদের আমরা বিদ্যালয়ে পাঠাই। শিক্ষার নানা উপকরণ কিনে দিই। প্রয়োজনে প্রাইভেট টিউটরের পিছনেও ব্যয় করি। কিন্তু শেখার জন্য বিদ্যালয়ের কী ধরনের পরিবেশ, পরিকাঠামো প্রয়োজন সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা ভাবি বিদ্যালয়ের গৃহ, শিক্ষক আর বইপত্র – এইসব থাকলেই ছেলেমেয়েরা শিখে যাবে।

নয়

স্যার, আমরা জানিনা আমাদের ফেলে আসা থ্রি- আর ফোরের ঘরের মাঝে এখন কোনো দেওয়াল দেওয়া হয়েছে কিনা। আমরা তো একটা বড় হল ঘরের একদিকে থ্রি আর অন্যদিকে ফোরের ছেলেমেয়েরা ভাগ করে বসতাম।একই ঘরে দুটো ক্লাস চলার সময় আমাদের পড়ার যে কী হাল হতো, তা বোঝবার মতো মন আপনাদের ছিল না। আজও যদি আপনারা দুটো ক্লাসের মাঝখানে দেওয়াল না দিয়ে থাকেন, তবে এখন যারা পড়ছে তাদেরও অবস্থা আমাদেরই মতোই হচ্ছে।

একই ঘরে দুটো ক্লাস বসিয়ে দিয়ে আপনারা চেয়ারে বসে শুধু পড়িয়ে যেতেন। কিন্তু পড়ায়

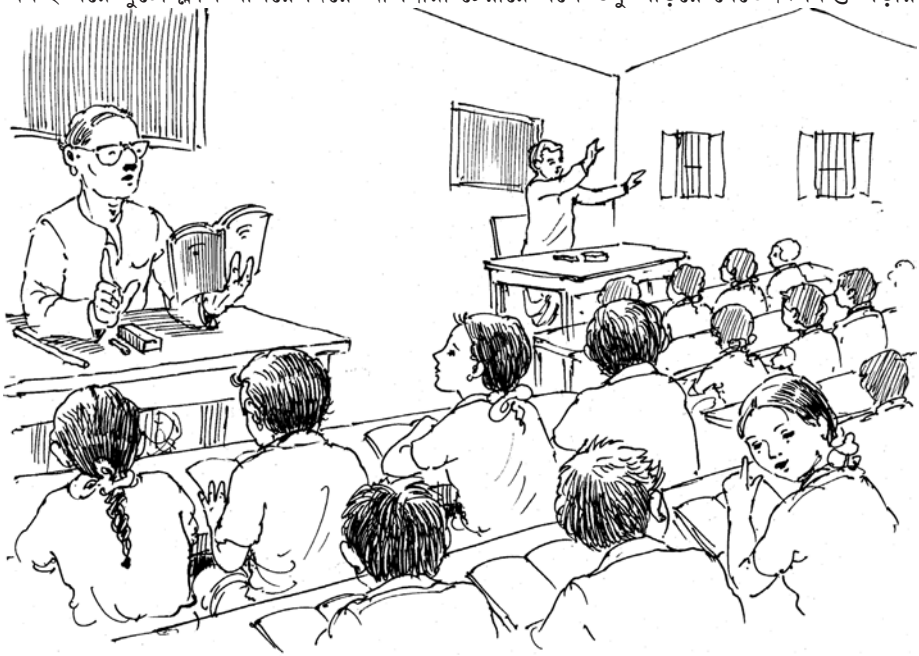

যে আমাদের মন যেতো না সেটা আপনারা বুঝতে পারতেন না। ফোরের ছেলেমেয়েদের পিঠে যখন ঘা পড়তো তখন শব্দটা থ্রি-র ছেলেমেয়েদের কানে যেতো। তাদের ঘাড়টা তখন ফোরের দিকে ঘুরে যেত। সেই সময় আপনারা যা পড়াতেন সেদিকে মনটা না গিয়ে অন্যদিকে চলে যেতো।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যে ধরনের পরিকাঠামো ও পরিবেশের প্রয়োজন সেটার যোগান নিয়ে শিক্ষকদের একাংশ ভাবেন না এবং অন্যকে ভাবানোর প্রয়োজনও মনে করেন না। মানুষকে ভাবাতে পারলে এতদিন পর্যন্ত অনেক দুর্বল পরিকাঠামো ও পরিবেশ নিয়ে বিদ্যালয়গুলি চলে আসতো না। মানুষের উদ্যোগে মন্দির-মসজিদ ভালো হতে পারে, আর বিদ্যালয় হতে পারে না। তা কি হয়।

অবশ্য আপনারা মাঝে মধ্যে চিৎকার করে বলতেন – 'এই–ও দিকে ঘাড় ঘোরানো নয়। নিজের চরকায় তেল দাও।' কিন্তু বললে কী হবে ততক্ষণে তো যা হবার হয়ে গেছে। একই ঘরে দুটো ক্লাস চলার ফলে যেন হট্টগোলের বাজার চলতো।

স্যার, থ্রি আর ফোরের ঘরের মধ্যে একটা পার্টিশন দেবার ব্যবস্থা কি আপনারা করতে পারতেন না? গ্রামের মানুষের সত্যিই কি আকাল ছিল?

আপনাদের হয়তো মনে পড়বে একবার স্কুলের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জোতদার বাড়ির বড় ছেলে অবনীবাবু মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন – 'আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে এই স্কুল তৈরি করতে গ্রামের সব মানুষ হাত লাগিয়েছিলেন। আজ অনেক ছেলেমেয়ে এই স্কুল থেকে পাশ করে কলেজে পড়াশোনা করে বড় বড় সরকারি পদে চাকরি করছে। গ্রামের মানুষ স্কুল গড়তে, কেউ জমি দিয়েছিলেন, কেউ ইট দিয়েছিলেন, কেউ আবার বাঁশ, কাঠ দিয়েছিলেন। অনেক গরিব মানুষ ছিলেন যাঁরা পয়সা-কড়ি দিতে পারেনি। কিন্তু তারা গায়ে গতোরে খেটে দিয়েছিলেন।' এখন মনে হয় পুরনো দিনের মানুষগুলোই ভালো ছিল। আপনারা কি স্যার পুরনো দিনের মানুষগুলোর মতো হতে পারেন না?

দশ

স্যার আমাদের অঙ্ক শেখার একটা ঘটনার কথা বলি। আমরা তখন অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। একদিন দেখি- স্কুলের পাশে রাস্তার ধারে সাদা দুটো অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়াল। স্কুল তখনও শুরু হয়নি। আমরা তখন সবাই খেলার মাঠে খেলছিলাম। আপনারা তখন একজন স্যারও আসেননি। আমরা দেখলাম গাড়িগুলো থেকে চার-পাঁচজন লোক নামলেন। আমরা বুঝলাম- এরা ঠিক বাইরে থেকে আমাদের স্কুল দেখতে এসেছেন। মানুষগুলোকে নামতে দেখে আমরা ভয় পেয়ে সবাই ছুটে নিজের নিজের ক্লাসে ঢুকে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি তাঁরা আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতেই ঢুকলেন। কিছুলোক আবার আমাদের ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা লোক বোর্ডের কাছে এসে আমাদের সঙ্গে হেসে - খেলে বেশ কথা বলতে লাগলেন। লোকটাকে বড় অফিসার বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কথা বলাটা ছিল সাদাসিধে। বড় অফিসার তা ধরবার জো ছিল না।

এরই মধ্যে দেখি জানালার চারপাশে আমাদের গ্রামের অনেক লোকও জড়ো হয়ে গেছে। সবাই ব্যাপারটা জানতে চলে এসেছে।

কথা বলতে বলতে অফিসারটা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন – 'তোমরা অঙ্ক শিখেছ?'

আমাদের মধ্য থেকে দু'একজন বললো আমরা গুণতে পারি। সংখ্যা লিখতে পারি। যোগ করতে পারি। বিয়োগও করতে পারি।

আমাদের কথা শুনে অফিসারটা বললেন – 'আমি একটা যোগ অঙ্ক দিলে তোমরা করে দেখাতে পারবে?'

আমাদের কেউ কেউ বললো – 'হ্যাঁ স্যার।'

তখন অফিসারটা বোর্ডে আটাশ লিখে ফের তার তলায় আটাশ লিখে বাঁ দিকে যোগের চিহ্ন দিয়ে একটা যোগ অঙ্ক দিলেন।

তারপর আমাদের ভিতর থেকে বিনোদকে ডেকে বললেন – 'তুমি অঙ্কটা করতে পারবে?'

বিনোদ বললো – 'হ্যাঁ স্যার পারবো।' তখন স্যারটা বিনোদকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে হাতে চক ধরিয়ে দিয়ে বললেন – 'তাহলে তুমি অঙ্কটা করো।'

এদিকে তখন জানালা - দরজায় লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। পাড়ার সব লোক ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে। তখন অবশ্য আপনারাও চলে এসে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন। আমাদের ক্লাসের পিছনে দাঁড়ানো অফিসারদের বসানোর জন্য চেয়ার টানাটানি শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিনোদ বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাদের বুক দুর-দুর করছিল। কি হয়, কি হয় – এইভেবে। তারপর দেখলাম, বিনোদ ডানদিকের আট দুটোকে যোগ করে লিখলো ষোল আর বাঁ দিকের দুই সংখ্যা দুটোর তলায় লিখলো চার। সব মিলিয়ে চারশো ষোল। বিনোদ অঙ্কটা করার পর অফিসারটা আমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন – 'বলো তো – অঙ্কটা ঠিক হয়েছে, না ভুল হয়েছে?'

হঠাৎ দেখি ক্লাসের অর্ধেক ছেলেমেয়ে হাত তুলে বললো – 'স্যার ভুল হয়েছে।'

তখন অফিসারটা অনিমেষকে ডেকে বললো – 'তুমিতো বলছো অঙ্কটা ভুল হয়েছে? তাহলে তুমি কি অঙ্কটা ঠিক করে দিতে পারবে?'

অনিমেষ বললো – 'হ্যাঁ স্যার।'

ইতিমধ্যে নন্দি স্যার অফিসারটাকে বোঝাতে শুরু করেছেন – 'স্যার, এরা গরিব পরিবারের ছেলেমেয়ে। সব দিন স্কুলে আসে না। বাড়িতেও কেউ দেখিয়ে দেবার নেই। মাথাতেও তেমন বুদ্ধি নেই।'

নন্দি স্যারের কথা শুনে অফিসারটা বললেন – 'আপনি বসুন, আমি কী করছি দেখুন।'

তারপর অফিসারটা অনিমেষকে ডাকলেন।

অনিমেষ ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটা ঠিক করে দিল। অনিমেষ যোগফল লিখলো – ছাপান্ন। তারপর অফিসারটা সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন – 'এবার কি অঙ্কটা ঠিক হয়েছে?'

ক্লাসের অর্ধেক ছেলেমেয়ে বললো – 'হ্যাঁ স্যার, ঠিক হয়েছে।' এরপরই অফিসারটা যারা অনিমেষের অঙ্কটা ঠিক বললো – তাদের সবাইকে বাঁদিকের দেওয়ালের গায়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বললেন। ওরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমাদের বললেন – 'তোমরা সবাই ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে যাও।' আমরাও সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। অঙ্কটা ঠিক

করার দলটা বাঁদিকে দাঁড়ালো। আমরা ভুল করার দলটা ডানদিকে।

এরপর অফিসারটা বোর্ডে পাঁচ/ছ'টা আগের মতো নানা সংখ্যার যোগ দিলেন। তারপর দেওয়ালের বাঁদিকে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন – 'তোমরা কি এই অঙ্কগুলো করতে পারবে?'

ওরা সবাই বললো – 'হ্যা স্যার।'

তারপর দেখলাম, অফিসারটা ওদের দলের একজন আর আমাদের অঙ্ক না পারা দলের একজনকে ডেকে নিয়ে দু'জন করে দল করে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। আমরা সব দু'জন দু'জন মিলে ছোট ছোট দল হলাম।

তারপর অফিসারটা বললেন – 'বোর্ডের অঙ্কগুলো তোমরা যারা করতে পারছো তারা তোমাদের নিজের নিজের বন্ধুদের শেখাও।' এই কথা বলেই অফিসারটা এবং অন্য সবাই মিলে থ্রি-র ঘরে চলে গেলেন।

এরপর আনন্দের সঙ্গে আমাদের ক্লাসের সবাই নিজের নিজের বন্ধুদের অঙ্ক শেখাতে শুরু করলো।

অফিসারদের দলটা অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঠিক আধঘন্টা পরে আবার আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। অঙ্ক কষতে দেওয়া অফিসারটা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন – 'তোমরা সব অঙ্কগুলো শিখতে পেরেছো?'

এই কথা শোনা মাত্র আমরা সবাই মিলে তখন আমাদের খাতাগুলো নিয়ে হুড়মুড়িয়ে টেবিলের উপর হাজির হলাম। অফিসারটা তখন আমাদের সবার খাতা দেখে খুব খুশি হলেন। তারপর

ব্ল্যাকবোর্ডটা মুছে দিয়ে আবার একটা যোগ অঙ্ক দিলেন। এবার আমাদের অঙ্ক না পারা দল থেকে শম্পাকে ডেকে নিয়ে অঙ্কটা করতে দিলেন। শম্পা অঙ্কটা করে দিল। শম্পাকে সবাই মিলে হাততালি দিয়েছিল।

যাবার সময় অফিসারটা নন্দি স্যারকে শুধু বলেছিলেন – 'এরা গরিব হলেও বুদ্ধিতে যে ঘাটতি নেই, তার প্রমাণ পেলেন তো। শেখানোর কৌশল আর দরদটাই আসল কথা। এটা বুঝতে হবে নন্দিবাবু।'

অফিসার লোকগুলো চলে যাবার পর আমরা সেদিন ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা আনন্দে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সবার মনে হয়েছিল বাইরে থেকে আসা ঐ অফিসারটা যদি আমাদের স্যার হতো, তবে আমরা কত আনন্দ করেই না শিখতে পারতাম।

কিন্তু অফিসাররা চলে যাবার পর আপনারা ক্লাসে এসে আমাদের সব আনন্দ মুছে দিয়েছিলেন। নন্দি স্যার ক্লাসে এসে বিনোদ, শম্পা আর আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েগুলোকে কী গালাগালিই না দিয়েছিলেন। বলেছিলেন – 'অঙ্ক দিলে আমাদের কাছে করে দেখানোর ক্ষমতা নেই। আর বাইরের লোকের কাছে সাবাস নিতে যাচ্ছো। পিটিয়ে বিদ্যের বহর দেখানো বার করে দেবো।' আপনাদের শাসনটা বেশি ছিল স্যার, ভালোবাসাটা কম। শেখানোর জন্য চাপ ছিল। কিন্তু শেখানোর কৌশলটা ছিল না।

এগারো

স্যার, বাংলা পড়া আর অঙ্ক শেখার নানা ঘটনার কথা অনেক বললাম। এবার আমাদের ইংরেজি শেখার দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলি। ইংরেজি পড়তে গিয়ে প্রথমে বড় হাতের অক্ষর চেনার পর যখন আমরা ছোট হাতের এ.বি.সি. অক্ষর চিনতে শুরু করলাম তখন সব গুলিয়ে যেতো।

বাংলায় অবশ্য ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর চেনার ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেখানে অবশ্য অন্য রকম ঝামেলা ছিল। যেমন – আকার, একার, মাত্রা, বফলা, র ফলা – এই সব কত কী। প্রথম প্রথম ইংরেজি শিখতে গিয়ে বি এ –ব্যা, সি এ – ক্যা, এই সব ছোট ছোট শব্দ পড়তে বেশ ভালো লাগতো। কিন্তু সাত আটটা অক্ষর মিলে যখন বড় বড় বানান এসে গেল তখনই ইংরেজি পড়া কষ্টকর হয়ে গেল। ইংরেজিতে আমাদের বেশি ঝামেলা হতো। কারণ – প্রথমে অনেকগুলো অক্ষর মিলে বানান করা, তারপর শব্দটাকে ঠিকভাবে উচ্চারণ করা, তারপর আবার ইংরেজিটার বাংলা মানে জানা।

বাংলায় অবশ্য উচ্চারণ করতে পারলেই মানেটা বোঝা যেতো। কিন্তু ইংরেজিতে সেটা হবার

শেখার ক্ষমতা সব শিশুরই আছে। কে কতটা শিখতে পারবে এবং তার কতটা প্রয়োগ করতে পারবে সেটা নির্ভর করছে শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর। এটা সবটাই শিক্ষককে ভেবে বার করতে হবে। ভাবনার নিষ্ক্রিয়তার অর্থ শেখাটাও থমকে যাওয়া।

জো ছিল না। ছাতার ইংরেজিটা অনেক বড় ছিল – আমব্রেলা। এর বানান মুখস্থ করা আবার একটা বাড়তি ঝামেলা ছিল। ইংরেজিতে মানে আর বানান দুটোই একসঙ্গে শিখতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যেতো। বাংলায় যখন পড়তাম – আতাগাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ – তখন এর মানেটা আমরা বুঝতে পারতাম। কিন্তু ইংরেজিতে তা হবার উপায় ছিল না।

দু-চারটে ইংরেজি কথা আজও মনে আছে। ইংরেজিতে কুইন, স্পাইডার, ফ্লাওয়ার,কিং – এসব বানান করে শব্দ উচ্চারণ করতে কষ্ট হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা এর একটা সহজ পথ বাতলে দিতে পারতেন না। ফলে ইংরেজির নাম শুনলেই মনটা ভয়ে ধক্ ধক্ করে উঠতো।

বাংলাটা আমাদের বাড়িতে কারও কারও বাবা-মা একটু আধটু যদিও দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু ইংরেজিটা শেখার জন্য বাড়ি থেকে আমরা একবিন্দু সাহায্য পেতাম না। আমাদের এই যন্ত্রণাটা আপনারাও বুঝতেন না।

আর একটা দুঃখের কথা বলি – স্কুলে শেখা ইংরেজি শব্দগুলো মনে রাখার জন্য বাড়ি বা পাড়ায় মাঝে মধ্যে ইংরেজি বলতাম। তখন পাড়ার বড় ছেলেরা এমন টিপ্পুনি কাটতো যে ইংরেজি আর মুখে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করতো না। আসলে স্কুলে একটু আধটু ইংরেজি আমরা যা শিখতাম তা বাড়ি আর পাড়ায় চর্চার বড় অভাব ছিল।

আমাদের আর একটা সমস্যা হতো – ইংরেজি কথার মানে বার করার সময়। অনেক কষ্ট করে ইংরেজি শব্দগুলোর মানে বার করতে পারতাম। কিন্তু সব শব্দগুলোর মানে জুড়তে গিয়ে গোলমাল লেগে যেতো। সেই সময়ের ইংরেজি মানে করার কষ্টের কথা এখনও একটু আধটু মনে আছে। আমরা পড়তাম – দি বার্ড ইজ ফ্লাইং। যখন মানে সাজাতাম – তখন এই রকম হতো – দি মানে –টি, বার্ড মানে – পাখি, ইজ মানে - হয়, ফ্লাইং মানে –উড়ছে। সব মানেটা জুড়তে গিয়ে – ঠিক বাংলা বাক্য তৈরি হতো না। মানে দাঁড়াত – টি পাখি হয় উড়ছে। কোনটা আগে কোনটা পরে হবে তা বুঝতাম না। এসব কষ্টগুলো আপনারা কোনোদিন মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন না। আমরাও কষ্টটা তখন আপনাদের বোঝাতে পারতাম না। আপনারা ভেবেই নিয়েছিলেন আমাদের শেখাটা আমাদের মতো করেই শিখতে হবে। শেখানোয় আপনাদের কোনো দায় নেই।

বারো

স্যার, পড়ার বিষয়ে আমাদের নানা দুঃখ-যন্ত্রণার কথা লিখলাম। এবার আমাদের লেখা শেখার নানা যন্ত্রণার কথা বলি। আমাদের পড়ার অভ্যাস যেমন এক একজনের এক এক রকম ছিল। তেমনি লেখার অভ্যাসও নানা জনের নানা রকম ছিল। লেখা শেখাটা যে আমরা কত রকম ভাবে শিখেছিলাম তা বলি শুনুন।

প্রথম যখন আমরা বর্ণ চেনার পর লেখা শুরু করলাম –তখন কেউ একটু আধুটু বাবা মা- র কাছে শিখেছিলাম। অবশ্য যাদের বাবা-মা একটু আধটু লেখাপড়া জানতো। আর যাদের বাবা-মা লেখাপড়া জানতো না, তারা সবাই হয় আপনাদের কাছে, না হয় এর-ওর কাছে দেখে শিখেছিলাম।

আমাদের অনেকেরই বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে ছিল। সন্ধ্যেবেলা একটা ছোট লম্ফ আলো কিংবা একটা হ্যারিকেন নিয়ে আমরা ৩/৪ জন মিলে পড়তে বসতাম। আলোটা সবাই পালা করে নিয়ে আসতাম। এই সময় আমাদের বাবা-রা কেউ কেউ লম্প আলোয় বিড়ি ধরাতে

এসে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে বসতো। তারপর সখ করে লেখা শেখানোর জন্য স্লেটের উপর পেনসিল ঠেকিয়ে আমাদের হাত চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিত। তখন শিখবো কী, মনে হতো হাতটাই দুমড়ে মুচড়ে যেন ভেঙে যাচ্ছে। এইভাবেই যখন একটু আধটু শিখতে শুরু করলাম তখন অক্ষরগুলোকে যে দিক থেকে শুরু করলে সুবিধে হতো, সেই দিক থেকে শুরু করে শুধু ছবির মতো আঁকতাম। 'অ' লেখার শেখার সময় কেউ আগে গোল পাকাতাম, তারপর পাশের লাঠিটা আঁকতাম। তারপর মাথায় দাগটা দিতাম। কেউ আবার আগে মাথার দাগ কাটতাম তারপর অন্য কেরামতি করতাম। কেউ 'ল' কে ডান দিকে শুরু করে ঢেউ খেলিয়ে

বাঁ দিকে আনতাম। কেউ আবার ঢেউ খেলানো দিক থেকে শুরু করে ডানদিকে নিয়ে যেতাম।

ক্লাসে গিয়ে আবার মাঝে মধ্যে অন্যদের লেখা দেখে শিখতাম। তাতে আবার অনেক সময় আমাদের ভালোটা খারাপ হয়ে যেতো। আবার কখনো খারাপটা ভালো হয়ে যেতো। লেখা শেখার শুরুতেই আমাদের মধ্যে পাচঁমিশেলি লেখার অভ্যাস ঢুকে গিয়েছিল। আপনারা মাঝেমধ্যে শুরু থেকে যদি আমাদের ভুলগুলি শুধরে দিতেন, তবে আমাদের হাতের লেখা ভালো করার একটা দিশা পেতাম।

আমরা যখন আপনাদের কাছে খাতা জমা দিতাম, তখন আপনারা তা দেখে বলতেন – 'হাতের লেখা ঠিক করবি।' ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। কীভাবে ঠিক করবো, কোনখানে ভুল, এসব আর আপনারা দেখিয়ে দিতেন না। আমাদের মধ্যে যাদের হাতের লেখা একটু ভালো ছিল, তারা বাবা-মা-র কাছে শিখে আসতো, আমরা মাঝে মধ্যে ওদের দেখেও ঠিক করে নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওরা খাতাপত্র সরিয়ে নিত। যদিওবা জোর করে দেখে নিতে চেষ্টা করতাম অমনি আপনাদের কাছে নালিশ চলে যেতো। আর আপনারা দমাদম আমাদের পিঠে , মাথায় ঘা কতক ধরিয়ে দিতেন।

আসলে স্যার, যারা গরিব তারা অনেক কিছুই পায় না। খাবার পায় না, জামা-কাপড় পায় না, ঘর পায় না। আবার লেখাপড়াটাও পায় না। সব অভাব যেন গরিবের মায়ের পেটের ভাই। তাই গরিবের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে।

স্যার, আমরা কেমন লিখতাম তার দু-একটা নমুনা আমাদের এখনও মনে আছে, সেগুলো একটু দেখাই –

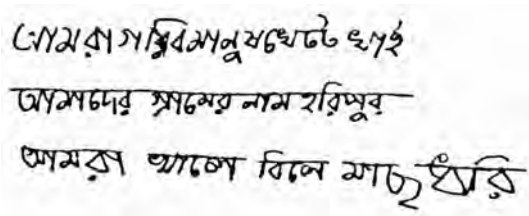

কানাই, বিনোদ আর পল্টু-র হাতের লেখা এখনও এই রকমই রয়ে গেছে। স্কুলে থাকার সময় যদিওবা একটু ভালো ছিল স্কুলছাড়ার পর চর্চার অভাবে আরো খারাপ হয়ে গেছে।

স্কুলে থাকার সময় পড়ার ফাঁকে বাড়ি আর মাঠের নানা কাজ করতে হতো।শক্ত শক্ত নানা কাজ করতে হতো। যার ফলে আমাদের কচি আঙুলগুলো অনেকটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হতো শক্ত আঙুলের জন্যই মনে হয় হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই সব ভেবেই মনটাকে সান্ত্বনা দিতাম।

এখন যারা স্কুলে যাচ্ছে মনে হয় তাদের হাতের লেখাও আমাদের মতোই হচ্ছে। কারণ অনেকেই তো আমাদের মতোই গরিব পরিবার থেকে যায়।

ইংরেজি লেখার সময়ও আমাদের একই সমস্যা হতো। ইংরেজি অক্ষরগুলো কোন দিক থেকে শুরু করবো আর কোন জায়গায় শেষ করবো, এসব বুঝতে পারতাম না। ওটাকে ছবি আঁকার মতো যেদিক থেকে পারতাম শুরু করতাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি স্যার, বাংলা লেখার থেকে আমাদের ইংরেজি লেখা অনেকটা সহজ মনে হতো। ইংরেজিতে বাংলার মতো মাত্রা, য ফলা, র-ফলা যুক্তাক্ষর ছিল না। তাছাড়া ইংরেজি অক্ষরগুলোতে বাংলার মতো নানা প্যাঁচ-পোঁচ ছিল না। ফলে ইংরাজিটা অনেকটা সহজ মনে হতো।

কিন্তু ইংরেজি লেখার সময় কোনো অক্ষরটার মাথা উপরে উঠতো, কোনোটার নিচের দিকে নামতো, কোনোটার আবার পেটটা ডাইনে বড়, কোনোটার পেটটা বাঁয়ে বড়। সঠিকভাবে লিখতে কারোও সাহায্য না পেয়ে আমরা অক্ষরগুলো যেদিক থেকে লিখলে সুবিধে হতো সেদিক থেকে শুরু করতাম। আমাদের ইংরেজি লেখার দু একটা নমুনা আপনাদের দেখাই –

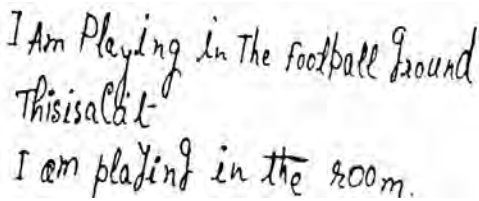

স্যার, দুঃখের বিষয় হলো আমরা এই রকম সব গোলমেলে লেখা লিখে খাতাগুলো আপনাদের টেবিলে জমা দিলেও আপনারা তা ঠিক করে দিতেন না। শুধু দু-একজনের খাতা দেখে ঠিক করে দিয়ে বলতেন- ওর কাছ থেকে দেখে নিবি। তারপর ক্লাসে ঘণ্টা পড়ে যেতো। আপনারা চলে যাবার পর যেই অন্যদের খাতাগুলো চাইতাম, তখন তারা আর খাতাগুলো বার করতো না। আর আমাদের জগাখিচুড়ি মার্কা লেখার যা হাল তাই –ই থেকে যেতো। সেটা আর সংশোধন হতো না।

আপনারা একবার আমাদের ইংরেজি হাতের লেখা ভালো করার জন্য একটা সরু সরু দাগ টানা খাতা কিনতে বলেছিলেন। কিন্তু কেনার পর সেই খাতায় লিখতে গিয়ে আমাদের নানা সমস্যা হতো। অনেকগুলো লাইনের মধ্যে কোন লাইনে অক্ষরের ল্যাজ, কোনটায় অক্ষরের মাথা, কোন লাইনে অক্ষরের পেটটা থাকবে তা বুঝতে পারতাম না। বাংলা অক্ষরগুলো একই মাপের ছিল। প্রত্যেকটা অক্ষরের উপর নিচ মোটামুটি সমান করে লিখলেই হতো। ইংরেজিতে অক্ষরের মাপের হেরফেরটা প্রথম প্রথম আমাদের বুঝতে কষ্ট হতো। ফলে প্রথম প্রথম এই খাতা কিনেও লাভ হয় নি। কারণ খাতাটা কীভাবে ব্যবহার করবো তা আপনারা দেখিয়ে দিতেন না।

আমাদের স্পষ্ট মনে আছে পল্টু একবার নন্দি স্যারকে বলেছিল বোর্ডে লাইন টেনে লেখার ধরনটা দেখিয়ে দিতে। নন্দি স্যার তো পল্টুর কথায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পল্টুকে এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন – 'বোস, ডেঁপো ছেলে কোথাকার, স্যারকে হুকুম করা হচ্ছে। ওর যেন আমি

চাকর, তাই ওর হুকুমে আমাকে পড়া দেখাতে হবে।'

নন্দি স্যারের ধমকানিতে আমাদের হাতের লেখা শেখার সখ মিটে গিয়েছিল।

আসলে নন্দি স্যারেরা খুব বড়লোক ছিলেন। মাঠের অর্ধেক জমি শুনতাম নন্দি স্যারেদের। গাঁয়ের বেশির ভাগ ক্ষেতমজুর নন্দি স্যারেদের জমিতে মজুর খাটতো। গাঁয়ের জন-মুনিষদের ওদের বাড়িতে ঢোকা নিষেধ ছিল। গোটা গাঁয়ের উপর ওদের দাপট ছিল। নন্দি স্যারের বাড়ির লোকরা গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে খুব একটা মেশামেশি করতেন না। নন্দি স্যার স্কুলে এসে গরিব ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে গাঁয়ের জমিদারের মতোই ব্যবহার করতেন। শিক্ষকের মতো নয়।

অনেকদিন আগে আমাদের ক্ষেতমজুর পাড়া আর মুসলিম পাড়া মলে নন্দি স্যারদের খাস জমির দখল নিয়েছিল। এইজমি দখল নিয়ে নন্দি স্যারদের সঙ্গে গাঁয়ের গরিব মানুষদের অনেক দিন ধরে গোলমাল চলেছিল। পুলিশ আর পার্টির লোকেরা মিলে এসবের মীমাংসা করে দিয়েছিল।

নন্দি স্যাররা আগাগোড়াই গরিব পাড়াটাকে ভালো চোখে দেখতেন না। স্কুলেও নন্দি স্যারটা যে আমাদের গরিব পাড়ার ছেলেমেয়েদের ঘৃণা করতেন তা নন্দি স্যারের ব্যবহারে বোঝা

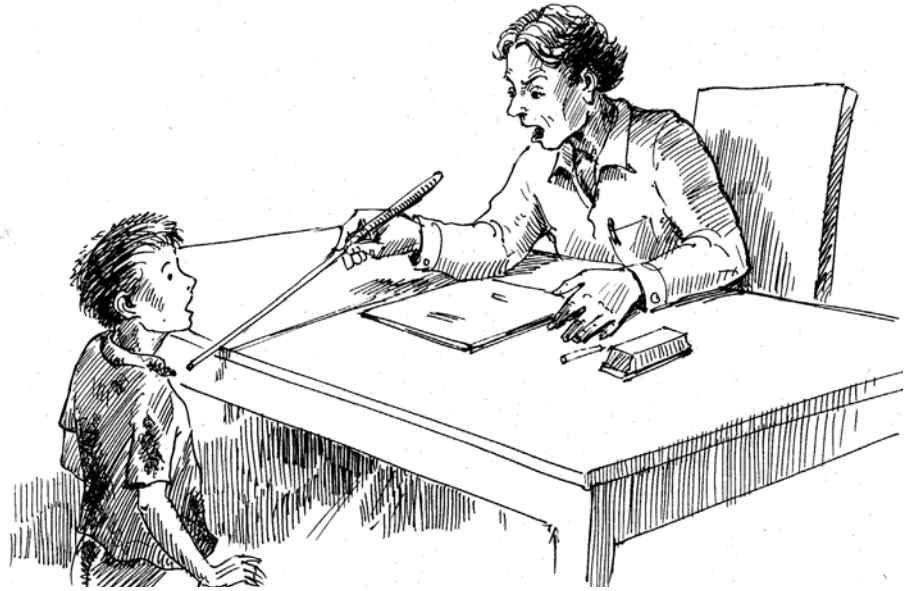

যেতো। নন্দি স্যার ক্লাসে আমাদের কোনোদিন নিজের কাছে ঘেঁসতে দিতেন না। কাউকে টেনে আনার দরকার হলে ছড়ি দিয়ে টানতেন আবার ছড়ি দিয়েই ঠেলে দিতেন। কোনোদিন কারও হাত ধরে বা জামা ধরে কথা বলতেন না।

অবশ্য আমাদের জামা প্যান্টেও নোংরা থাকতো। নন্দি স্যারের এই ব্যবহারটা দেখে আমরাও নন্দি স্যারকে মনে মনে ঘেন্না করতাম। কোনোদিন আমাদের মাস্টার বলে মনে করতাম না। মনে হতো লোকটা গ্রামেও জমিদার আর স্কুলেও জমিদার।

ইংরেজি হাতের লেখায় আমাদের আর একটা ভুল হতো। প্রত্যেকবার বাক্য লেখার সময় প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের লিখতে হতো। আবার বাক্যের মাঝেও কখনো সখনো বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করতে হতো। এই জায়গায় আমাদের ভীষণ ভুল হতো। ছোট হাতের আর বড় হাতের অক্ষরের গোলমালটা অনেকেরই হতো। অবশ্য আপনারা মাঝেমধ্যে খাতা দেখে বলে দিতেন – এখানে বড় হাতের হবে। কিন্তু কেন বড় হাতের হবে, তা কোনোদিন বুঝিয়ে বলতেন না। এইভাবেই আমাদের পড়ায়, লেখায় নানা রোগ থেকে গিয়েছিল, যা আমরা বুঝতে পারলেও আপনারা কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেন নি।

মাঝেমধ্যে আপনাদের হাতের লেখা অনুকরণ করে আমাদের হাতে লেখাটা শুধরে নেবার ইচ্ছে হতো। কিন্তু আপনাদের হাতের লেখা দেখার সুযোগ আমাদের হতো না। আপনাদের কাছে খাতা জমা দিলে তা দেখে লেখাটা ঠিক হলে আপনারা একটা টিক চিহ্ন দিতেন। ভুল হলে ঢ্যাঁড়া চিহ্ন দিয়ে কেটে দিতেন। ভুল করা জায়গাটা যদি লিখে ঠিক করে দিতেন, তাহলে আপনাদের হাতের লেখার স্বাদ পেতাম। অবশ্য কাউকে যে দেখিয়ে দিতেন না, তা বলছি না। ভুল হলে লিখে ঠিক করেও দিতেন। তবে সেই আপনাদের পছন্দের ছেলেমেয়েগুলোর খাতায়। আপনাদের এই ইচ্ছেটা আমাদের সবার খাতা পর্যন্ত গড়িয়ে আসতো না।

কখনোসখনো আপনারা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতেন, তা দেখে আমরা খানিকটা অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম। ছিদাম স্যার যদিও বা মাঝেমধ্যে এক আধবার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতেন, কিন্তু ছিদাম স্যারের হাতের লেখা দেখে আমাদের অনুকরণ করার ইচ্ছেটা মাথায় উঠে যেতো। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা ব্ল্যাকবোর্ড দেখবে কী, বোর্ডে তো লেখাই ফুটতো না। বোর্ডে লেখার সময় আপনাদের হাতের চক্ পেনসিল বোর্ডের উপর মাঝেমধ্যে পিছলে যেতো।

একদিন ছিদাম স্যার বোর্ডে লিখছিলেন। সেই সময় স্যারের চক্ পেনসিলটা বার বার পিছলে যাচ্ছিল।

এই হাল দেখে ক্লাসের পিছনে বসে পল্টু চুপিসারে বলেছিল – 'আমাদের স্যারেরা ঘিয়ে ভাজা

শিশুরা শিক্ষকের কাছে শুধু পড়াশোনাই শেখে না। সেই সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ, নিষ্ঠা,তাদের ভালোবাসা, পঠন- পাঠন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের দরদ, শেখানোর সময় নানা শিক্ষা উপকরণের প্রয়োগ – সবকিছুই তারা পরখ করে, উপলব্ধি করে। আর এইসব উপলব্ধি অভিভাবক স্তর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ বছরের পর বছর ধরে সমাজে সঞ্চালিত হয়ে আসছে। এটা একটা প্রক্রিয়া। কিংবা বলা যায় বিদ্যালয় থেকে সমাজে প্রতিবার্তা যাবার রাস্তা। শিশুর অগ্রগতি যেমন শিক্ষকরা পরিমাপ করেন। শিক্ষকের ভূমিকাও শিশুরা মাপতে পারে। কিন্তু সে মাপের মূল্য সমাজ দেয় না।

চক দিয়ে লেখে তাই চক পিছলে যায়।' পল্টুর কথাটা শুনে ক্লাসের সবাই সেদিন হো হো করে হেসে ফেলেছিল। তারপরই ছিদাম স্যার সেদিন আমাদের পিছনের দিকের সব ছেলেমেয়েগুলোকে পাইকারি হারে পিটিয়েছিলেন।

পরের দিন রহমত স্যার ক্লাসে আসার পর আমরা রহমত স্যারকে বলেছিলাম – 'স্যার, আমরা বোর্ডের লেখা বুঝতে পারি না।' উত্তরে রহমত স্যার আমাদের বলেছিলেন – 'হ্যাঁ, বোর্ডটা রং করানো দরকার। কিন্তু রং করানোর জন্য সব স্যারেরা পয়সা দিতে রাজি হচ্ছে না।'

পল্টু আগাগোড়াই একটু পাকা পাকা কথা বলতো। সেদিন রহমত স্যারের কথা শুনে পল্টু বলেছিল – 'স্যার, সরস্বতী পুজোর কিছু পয়সা বেঁচেছে, ওই পয়সায় বোর্ড রং করা যায় না?'

রহমত স্যার পল্টুর কথা শুনে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন - 'সরস্বতী পুজোর পয়সা বেঁচেছে তুমি কোথায় শুনলে?' সেদিন পল্টু সবিনয়ে রহমত স্যারকে বলেছিল – 'স্যার আপনারাই একদিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন। তাই ক্লাসে বসে শুনেছিলাম।'

পল্টুর জবাব শুনে রহমত স্যার বলেছিলেন – 'ঠিকই শুনেছো। তবে সরস্বতী পুজোর পয়সা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড রং করানোয় সব স্যারের মত হবে না। কারণ সরস্বতী পুজোর পয়সা দিয়ে প্রতিবছর সরস্বতী পুজোই হবে।'

রহমত স্যার ক্লাস থেকে চলে যাবার পর পল্টু আমাদের বলেছিল – 'বোর্ডটা রং করা হলে এ বছর 'মা সরস্বতী' এসে বোর্ডটা দেখে খুশি হতেন।'

প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর সময় নন্দি স্যারই হর্তাকর্তা হতেন। আমরা শুধু ঠাকুর আনতাম আর বিসর্জন দিতে যেতাম। তবু সরস্বতী ঠাকুরকে আমরা বড্ড ভক্তি করতাম স্যার। কারণ আমাদের মতো গরিবরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তাম বলে সরস্বতীর মন পেতে বেশি করে মা সরস্বতীকে ডাকতাম।

তেরো

স্যার, একবার আমার বাবার কাছে সরস্বতী ঠাকুরের এক গল্প শুনে সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তিটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

বাবার কাছে শোনা সেই গল্পটা এবার বলি শুনুন - একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি আমাদের ঘরের দাওয়ায় বসে নিজের মতো করে পড়ছিলাম। এমন সময় বাবা সংসারের কাজকর্ম সেরে আমার কাছে এসে বসলো। তারপর বিড়ি খেতে খেতে কিছুক্ষণ আমার পড়া শুনে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলো – 'আচ্ছা বল দেখি – ঠাকুরের মধ্যে সরস্বতী বড়, না লক্ষ্মী বড়?'

পড়ার মাঝে বাবার কাছ থেকে এই প্রশ্নটা শুনে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। উত্তর দেবার জন্য মনের মধ্যে নানা ভাবনা আসতে লাগলো। অভাবের সংসারে ভাতের কষ্ট অনেক পেয়েছি।

ভাতের থালা থেকে একটা ভাত মটিতে পড়ে গেলে মা বলতো – 'ভাত মা লক্ষ্মী, ফেলবি না।

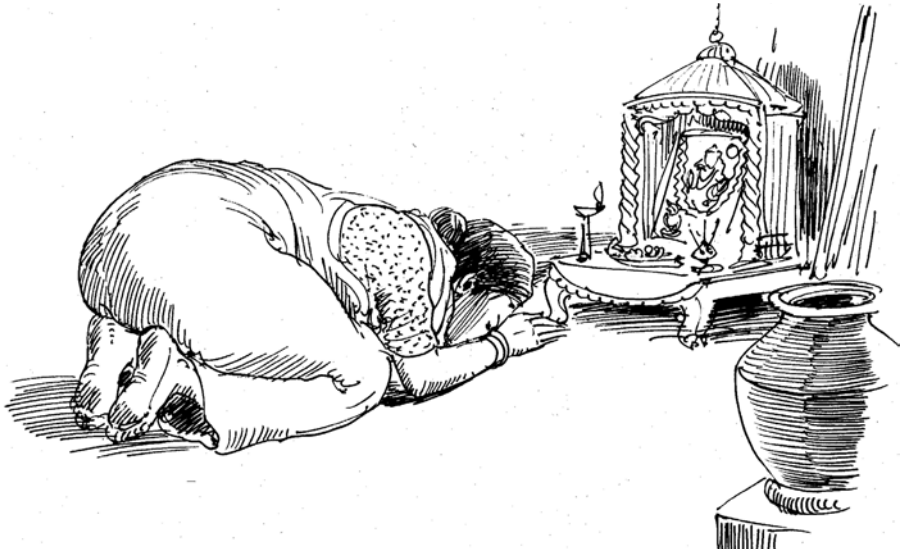

তাহলে বাড়িতে লক্ষ্মী হবে না।' মায়ের কথা শুনে লক্ষ্মীর প্রতি একটা ভয় জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু একদিকে বিদ্যার দেবী সরস্বতী – তাকে বড় না বললে বিদ্যে হবে না। আবার অন্যদিকে লক্ষ্মীকে বড় না করলে অভাবে ভাতের কষ্টে মরতে হবে। মনের মধ্যে কিছুক্ষণ এই দোটানা ভাব চলছিল। কিন্তু খেয়েপরে জীবনে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। এই কথাটা ভেবে নিয়ে শেষমেশ বাবাকে বলেছিলাম – 'লক্ষ্মীই বড়।'

বাবা আমার কথা শুনে একটু মুচকে হেসে পিঠে হাত রেখে বলেছিল – 'না রে পাগলা, সরস্বতীই বড়।'

আমাদের এই আলাপ - আলোচনাটা 'মা' পাশেই দাওয়ায় বসে রান্না করতে করতে শুনছিল।

বাবা সরস্বতীকে বড় বলতেই – মা রেগে গিয়ে বাবাকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল – 'বাড়িতে এইসব অলক্ষুণে কথা বলবে না। এসব কথা শুনলে মা লক্ষ্মী বিরাগ হবেন। তখন শত কষ্ট করেও বাড়িতে অন্ন জোটাতে পারবে না।' এই কথা বলেই মা রান্না ছেড়ে রেগেমেগে উঠে হাতে জল দিয়ে তারপর গলায় আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে হন হন করে ঘরের মধ্যে গিয়ে লক্ষ্মী ঠাকুরের টাটে একটা প্রণাম করেছিল।

আমিও কিন্তু মায়ের মতো বাবার কথাটা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু একটু ভেবে নিয়ে সরস্বতী কেন বড় তা বাবাকে প্রশ্ন করতেই, বাবা বলেছিল – 'জানিস লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর কোনো ভাব নেই। সেইজন্য দেখিস না, মা দুর্গা লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে দু'পাশে রেখে দেন। আবার বাড়িতেও দেখবি, যেই সরস্বতীকে বাড়িতে আনতে যাবি, অমনি লক্ষ্মী আগে

থেকেই পালিয়ে যাবে।'

বাবার এইসব হেঁয়ালী কথার আমি কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবু একটু ভেবে বাবাকে পুনরায় এর ব্যাখ্যা চাইলাম। তখন বাবা বললো – 'এই দ্যাখ, তোর পড়াশোনার জন্য অনেক বইপত্র কেনার দরকার হল। বই কেনার আগেই আমাকে এক বস্তা ধান বেচে দিতে হল। সরস্বতীকে আনতে গেলাম, তো লক্ষ্মী আগে থেকেই পালিয়ে গেল।'

বাবার এই অকাট গেঁয়ো যুক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু কে বড়, তার উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম – 'তাতে সরস্বতী বড় হল কী করে?' এরপর বাবা আমাকে যা বুঝিয়ে বললো তাতে আমার চোখ খুলে গেল।

বাবার কথার অর্থ না বুঝতে পেরে যখন হাঁ করে ভাবছি, তখন বাবা বললো – 'কি, কিছু বুঝলি না? – এই দেখ আমাদের গ্রামের নগেন বাবুর ছেলে সুধাংশু যখন পরীক্ষায় ভালো ফল করে ডাক্তারি পড়তে গেল, তখন নগেনবাবুর সংসারের সব পয়সাকড়ি ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে চলে যেতে লাগলো। নগেনবাবুর একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবার মতো অবস্থা। কিন্তু সুধাংশু একদিন ডাক্তারি পাশ করে ফিরলো। তখন ডাক্তারি করে ওর বাবার হারিয়ে যাওয়া সব পয়সা কেমন ফিরিয়ে আনলো। তাই বলছি সরস্বতীই বড়। সরস্বতীকে মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা কর। দেখবি লক্ষ্মী আপনিই চলে আসবে।'

বাবার কথাগুলো শুনে শুধু আমিই নয়, রান্না করতে করতে মা-ও যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

স্যার, বাবার ওই কথাগুলো শোনার পর সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হলে কী হবে, যে আশায় সরস্বতী মন্দিরে গেলাম সেখানেই সরস্বতীকে পেলাম না।

আপনাদের আচরণ দেখে মনে হতো আপনারা যেন সরস্বতীকে আটকে রেখেছেন। সরস্বতী যাতে আমাদের মতো গরিবগুলোর দিকে না তাকাতে পারে তারজন্য আপনারা ওকে আড়াল করে রেখেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় আপনারা সরস্বতীকে কিছু ছেলেমেয়েকে পাইয়ে দেবার ঠিকা নেওয়া লোক। সবার জন্য নয়।

স্যার স্কুলের ভিতরের নানা কথা বললাম, এবার স্কুলের বাইরের কিছু ঘটনার কথা বলি।

একদিনই বিকেলবেলা তিন চারজন লোক; সঙ্গে একজন দিদিমণিও ছিলেন, সবাই আমাদের গ্রামে এসে হাজির। আমাদের গ্রামের মনসাতলায় বিকেলবেলা এমনিতেই লোকজন বসে থাকে। সরকারি গাড়ি দেখে সবাই গাড়ির কাছে হাজির। তারমধ্যে আমরাও ছিলাম। আমাদের কারও কারও মায়েরাও জুটে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে সরকারি লোকেরা পাড়ার লোকেদের সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন – গ্রামের সব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় কিনা, মাঝপথে কেউ পড়া ছেড়ে দিয়েছে কিনা। পাড়ার লোকেরা যে যার মতো উত্তর দিচ্ছিল। সরকারি দলের দিদিমণিটা এরই ফাঁকে আমাদের মায়েদের কাছে

এসে হাজির। তারপর নানা প্রশ্ন শুরু করলেন –নেপালের মাকে কাছে পেয়ে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন - 'আপনার ছেলেমেয়েরা কোন ক্লাসে পড়ে?'

নেপাল তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়তো।

দিদিমণিটার কথা শুনে নেপালের মা বলেছিল – 'আমার কোনো মেয়ে নেই। একটা ছেলে, ক্লাস থ্রি-তে পড়ে।' নেপালের মা-র কথা শেষ না হতেই দিদিমণিটা জিজ্ঞেস করেছিলেন –'আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন?'

উত্তরে- নেপালের মা বলেছিল – 'সেই কোনকালে এক ক্লাস পড়ে যখন দু'ক্লাসে উঠে সবেমাত্র ছঁ মাস গেছি তখন আমার মায়ের একটা ছেলে হল। মা মাঠে মুনিষের কাজে যেতো, আর আমি ছোট ভাইকে বাড়িতে দেখভাল করতাম। তাই দেড় ক্লাসের মাঝেই শেষ। আর যাওয়া

হয়নি।'

নেপালের মায়ের কথাগুলো শুনে দিদিমণিটা খাতায় কিছু একটা লিখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন – 'নেপাল ক্লাস টু থেকে থ্রি-তে উঠতে কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে, জানা আছে?' নেপালের মায়ের উত্তর দেবার আগে আমাদের পাড়ার কেষ্ট মামা বলেছিল – 'দিদিমণি আজকাল তো আর স্কুলে নম্বর দেয় না। এখনতো সব বিষয়ে ক,খ,গ এইসব দেয়।'

দিদিমণিটা একটু মুচকি হেসে নেপালের মাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন – 'আচ্ছা বেশ, তাহলে আপনার নেপাল ক খ গ- এসবের মধ্যে কোনটা পেয়েছে?' নেপালের মায়ের উত্তর দিতে দেরি হচ্ছিল। তবু একটু ভেবেচিন্তে বললো, 'আমার ননদ বলেছে – বেশির ভাগ 'ঙ' পেয়েছে।'

এই কথা শুনে দিদিমণিটা জিজ্ঞেস করেছিলেন – 'আচ্ছা বলুনতো দিদি, পরীক্ষায় 'ক' পাওয়া ভালো, না 'ঙ' পাওয়া ভালো?'

এই প্রশ্ন শুনে কেবল নেপালের মা-ই নয়, চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার সব মায়েরাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি শুরু করে দিয়েছিল। শেষমেশ নেপালের মা দেড় ক্লাসের বিদ্যে নিয়ে মুখে একটু বিড়বিড় করে হিসেব করে বুক ঠুকে বলে দিয়েছিল – ''ঙ' পাওয়াই ভালো।'

নেপালের মায়ের কথাটা শুনে দিদিমণিটা কেমন যেন চমকে উঠলেন। তারপরই বলে উঠলেন - 'ও মাই গড়' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমণিটা নেপালের মাকে ফের জিজ্ঞেস করলেন 'পরীক্ষায় 'ঙ' পাওয়া ভালো কেন? 'ক' পাওয়া ভালো নয় কেন?'

নেপালের মা-ও ছাড়ার পাত্রী নয়। মনে মনে উত্তর সাজাতে শুরু করলো। তারপর গেঁয়ো অভিজ্ঞগতাকে কাজে লাগিয়ে সাহস করে বলে দিয়েছিল – 'ঙ' পাওয়াই ভালো। কারণ ক,খ,গ,ঘ-কে টপকে তবে 'ঙ' পেতে হয়। 'ক' পাওয়া সহজ, 'ঙ' পাওয়া অনেক কঠিন কাজ।'

নেপালের মায়ের কথাটা শুনে দিদিমণি ওদেরই দলের অন্য একজন অফিসারকে ডেকে বলেছিলেন – 'হালদার সাহেব এই হচ্ছে আপনার বিশ বছরের মূল্যায়ন ব্যবস্থার ধারণা। স্কুল থেকে বিশ বছর ধরে অনেক ছেলে-মেয়ে পাশ করে গেল ঠিকই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে স্কুল থেকে মাত্র দু'শো ফুট দূরের এইসব পরিবারগুলোর কাছে আজও ক,খ,গ- এর ধারণা অধরা থেকে গেল। মিঃ হালদার, এটাতো মানবেন – নিজের সন্তানের ভালোমন্দ বোঝার অধিকার সব বাবা-মায়েরই আছে।'

শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণে দুটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। একটি হল তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়। অপরটি হল শিশুর পরিবার। শিশুর সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার বিশ্লেষণ যদি শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই হয় তবে তা বেশি দূর এগোতে পারবে না। এখানে পরিবারেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিশুর সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান পরিবার পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া জরুরি। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কাজের ধ্যান ধারণা শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে অভিভাবকেরা তার অংশীদার হতে পারবেন না। বরং বিদ্যালয়ের কাজের অনেক কিছুই অভিভাবক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া জরুরি। আর এই বিস্তারের কাজটি শিক্ষকদেরই করতে হবে।

হালদার সাহেব বলে যে লোকটা দিদিমণির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি কথাগুলো শুনে একটু চুপ করে গেলেন। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে করতে গাঁয়ের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

সেদিন স্যার ওরা কী বুঝলেন তা ওরাই জানেন। তবে ওরা চলে যাওয়ার পর আমাদের মা-বাবা-রা যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা আজও বুঝলেন না।

পনেরো

স্যার, আমাদের দলের কানাইয়ের এক দুঃখের কথা এবার বলি শুনুন। কানাই মাঠে গরু রাখালি করে। কানাই ওর মনিবের গরুর সঙ্গে গ্রামের আর পাঁচজন চাষির গরু নিয়ে একসঙ্গে মাঠে চরাতে যেত। তাতে একটু বেশি পয়সা পেত। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক। একপাল গরু নিয়ে কানাই স্কুলের লাগোয়া মাঠে চরাচ্ছিল। সেদিন দুপুরে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে কানাই দৌড়ে গিয়ে স্কুলের পিছনের ছাঁচে আশ্রয় নেয়। এই সময় স্কুলের ছেলেমেয়েদের গলার আওয়াজ কানাইয়ের কানে ভেসে আসে। কানাই

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ওর ফেলে আসা থ্রি-র ঘরটা দেখছিল। ওর উঁকি মারা দেখে ক্লাসের ভিতর থেকে পাড়ার দু'একজন ছেলে-মেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলছিল। এই সময় নন্দি স্যার ক্লাসে ছিলেন। নন্দি স্যারের চোখ পড়ে যায় জানালার দিকে। যেই না চোখ পড়, অমনি নন্দি স্যার – 'কে রে ওখানে বলে', তেড়ে গিয়ে দেখেন কানাই জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে আধভেজা অবস্থায়। ব্যস! আর যায় কোথা। নন্দি স্যার হাতের ছড়ি নিয়ে তেড়ে গিয়ে বলেন – 'এই জানালার ধারে কি হচ্ছে, যা ওখান থেকে।' পারে তো ছড়ি দিয়ে শুধু স্কুলের ভেতরের

ছেলেমেয়েগুলোকে নয়, বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়াটাকেও ঘা কতক পিটিয়ে দেয় আর কি।

নন্দি স্যারের তাড়াখেয়ে স্কুলের ছাঁচতলা ছেড়ে কানাইকে সেদিন গরুর পালের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল।

স্যার, কানাই এখন অনেকটা বড় হয়েছে। সেদিনের দুঃখের কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। শেষে একটা কথা বলেছিল – 'জানিস, একবার স্কুল ছাড়লে, স্কুলের ভিতরে ঢোকার সুযোগ তো আর পাবি-ই না, এমনকি স্কুলের ছাঁচেও দাঁড়াতে পারবি না।'

স্যার, আপনারা হয়তো বলবেন – ছেলেমেয়েদের পড়ার ডিসটার্বের কথা ভেবে নন্দি স্যার সেদিন ঠিক-ই করেছিলেন। কিন্তু কানাইয়ের জীবনের পড়াশোনার কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। এই সমাজের ছাঁচতলা ধরে বাঁচার সুযোগটাও কী তার থাকতে নেই?

ভাগিস্য সেদিন ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে বাজ পড়েনি। তাহলে বাজে মরা গরুর সঙ্গে কানাইয়ের নামটাও হয়তো খবরের কাগজে ছাপা হতো।

ষোল

স্যার, হাবলুর বাবার সঙ্গে নন্দি স্যারের ঝগড়ার ঘটনাটা আপনাদের হয়তো এখনও মনে থাকবে। সেদিন আপনারা সব স্যারেরাই নন্দি স্যারের পক্ষ নিয়েছিলেন। আর হাবলুর বাবা বড় একা পড়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটা হল- সেদিন হাবলুর বাবা গ্রামের আরও কয়েকজন জন-মুনিষ আমাদের স্কুলের পাশে নন্দি স্যারেদের জমিতে কাজ করছিল। নন্দি স্যার সেদিন ক্লাসে পড়ানোর সময় মাঝেমধ্যে জানালা দিয়ে জন-মুনিষদের কাজের দিকেও নজর রাখছিলেন। একবার তিনি দেখতে পান যে, জন-মুনিষরা জমির আলে বসে কেউ তামাক খাচ্ছে, কেউ বসে সময় কাটাচ্ছে। দেখামাত্র নন্দি স্যার ক্লাস থেকে বেরিয়ে স্কুলের পিছনে গিয়ে জন-মুনিষদের বকাবকি শুরু করেন। একবার চেঁচিয়ে বলেও ফেলেন যে,– 'আমি যতবার তাকাচ্ছি ততবারই দেখছি তোরা কাজের থেকে বেশি গল্প করছিস। এখন দেখছি আবার বসে বসে বিশ্রামই নিচ্ছিস। এইভাবে যদি কাজ করিস তাহলে আজ কেউ পুরো মজুরি পাবি না। এই কথা বলে নন্দি স্যার ক্লাসে চলে আসেন।'

নন্দি স্যার ক্লাসে ঢোকার একটু পরেই হাবলুর বাবা কাদামাখা গায়ে হঠাৎ ক্লাসে এসে হাজির। ক্লাসে ঢুকেই নন্দি স্যারকে বলতে শুরু করে – 'বাবু, আমরা গরিব মানুষ। ছেলেমেয়েদের বেশি দূর লেখাপড়া শেখাতে পারবো না। অন্তত প্রাইমারিটা পর্যন্ত যদি একটু ভালো করে শেখে তবে কাজ চালানোর মতো হয়। কিন্তু আপনি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কী হচ্ছে সেদিকে নজর না দিয়ে, যদি সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে আমাদের কাজের ফাঁকি দেখেন, তবে

ওদের পড়াশোনার ভালোমন্দ কী হচ্ছে সেটা কে দেখবে বলুন?'

হাবলুর বাবার কথা শুনে নন্দি স্যার চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন– 'তুই আগে ক্লাস থেকে বার হয়ে যা। কার অনুমতি নিয়ে ক্লাসে ঢুকেছিস? স্কুলে ঢোকার কোনো অধিকার তোর নেই।' এই কথা বলেই হাবলুর বাবাকে মারে আর কি।

নন্দি স্যারের সঙ্গে হাবলুর বাবার ঝগড়া যখন চরমে উঠেছে তখন হাবলুর কি কান্না! ক্ষমতায়

কুলোবে না জেনেও হাবলু ওর বাবার কোমর জাড়য়ে ধরে ঠেলে ঘর থেকে বার করে দেবার মরিয়া চেষ্টা করেছিল।

বাচ্চা ছেলে হলেও বুঝেছিল – বড়লোকের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করা মানে গরিবের নিজের বিপদ ডেকে আনা।

সেই দিন আপনারা সব স্যারেরা এক হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই এক সুরে বলেছিলেন বিনা অনুমতিতে ক্লাসে ঢোকা অন্যায়।

নন্দি স্যারের সঙ্গে হাবলুর বাবার ঝগড়াটা স্কুলের ভেতর ঘটলেও তার খবরটা গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি আশপাশের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ক'দিন এসব নিয়ে পাড়ার আনাচে-কানাচে নানা আলোচনা হয়েছিল। আমরা ছোট হলেও এইটুকু বুঝেছিলাম – নন্দি স্যার আর হাবলুর বাবার ঝগড়াটা নিয়ে গ্রামে গরিব আর বড়লোকের মধ্যে তলায় তলায় একটা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল।

সতেরো

স্যার, রহমত স্যারটা ভালো মানুষ হলেও একবার রহমত স্যারের সঙ্গেও অহেতুক পাড়ার লোকেদের ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। অবশ্য এটা রহমত স্যার না হয়ে, যদি অন্য কোনো স্যার হতো, তবে তো সেদিন একটা বড় ধরনের কান্ড ঘটে যেতো। এটাও আপনাদের একবার স্মরণ করিয়ে দিই। একবার আমাদের স্কুলের মাঠের পাশে চায়ের দোকানে পাড়ার লোকেদের মধ্যে হঠাৎ জোর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল শীতকাল। রহমত স্যার অন্য স্যারেদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে চেয়ারে বসে ক্লাস টু-এর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাঠে দাগ কেটে খেলার মাধ্যমে জোড়-বিজোড় সংখ্যা শেখাচ্ছিলেন। রহমত স্যার মাঝেমধ্যে ট্রেনিং নিয়ে এসে আমাদের এসব শেখাতেন। আমাদেরও ভালো লাগতো।

কিন্তু সে দিন যখন স্কুলে খেলার মাধ্যমে শেখানো কাজ চলছিল, তখন চায়ের দোকানের চেঁচামেচি শুনে রহমত স্যার এগিয়ে গেলেন। পিছনে আমরাও দু'চারজন ছিলাম। রহমত স্যার চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে গ্রামের লোকেদের বললেন – 'ভাই,তোমরা এখানে চেঁচামেচি করছো আর এদিকে স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ার ডিসটার্ব হচ্ছে।'

এইকথা শুনে পাড়ার লোকজন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। সেদিন দোকানে হাবলুর বাবাও ছিল।

হাবলুর বাবা বলে উঠলো – 'মাস্টারমশাই, আমরা এখানে শুধু শুধু চেঁচামেচি করছি না। আপনাদের পড়ানোর কান্ড কারখানা দেখেই আমাদের চেঁচামেচি করতে হচ্ছে। আপনি না আসলে আমরাই একটু পরে স্কুলে ঢুকতাম।' মাঠে অন্য স্যারদের দিকে আঙুল দেখিয়ে হাবলুর বাবা বলতে শুরু করলো – 'আপনি তাকিয়ে দেখুন, এসব কী পড়াশোনা হচ্ছে? আপনাদের সামনেই বাচ্চাগুলো লাফালাফি করছে। এর পরেও আপনি বলবেন ছেলেমেয়েদের আপনারা পড়াশোনা করাচ্ছেন?'

হাবলুর বাবার সঙ্গে পাড়ার লোকেরাও তখন রহমত স্যারকে ঘিরে ধরেছিল। এই ঘটনার মধ্যে পড়ে রহমত স্যার প্রথমে একটু থতোমতো খেয়ে গিয়েছিলেন। উনি ভাবতে পারেননি যে ঝগড়ার কারণ তাঁরাই।

যাইহোক, ব্যাপারটা একটু বুঝে নিয়ে রহমত স্যার উপস্থিত সকলকে শান্ত করে বললেন – 'ভাই, দূর থেকে তোমরা যেটা ছেলেমেয়েদের খেলা বলে মনে করছো। ওটা আসলে খেলা নয়। ওদের আমরা খেলার মাধ্যমে সংখ্যা চেনা শেখাচ্ছি। আর কেউ ভুল করলে আমরা তা পিছনে বসে সংশোধন করে দিচ্ছি। ঘরের মধ্যে জায়গা কম বলে আমরা বাইরে মাঠে ওদের শেখাচ্ছি। আসলে দিনকাল বদলাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কায়দা কানুনও বদলে যাচ্ছে। এখন তো ছেলেমেয়েদের খেলার মাধ্যমে, আনন্দ সহকারে শেখাতে হবে। গত মাসে আমি বর্ধমানে একটা ট্রেনিং-এ গিয়েছিলাম। ওখানে ছেলেমেয়েদের শেখানোর জন্য নানা

কৌশল শিখে এসেছি। এই যে এখন আমরা যেটা শেখাচ্ছি এটাকে বলে 'আনন্দপাঠের শিক্ষা।'

রহমত স্যারের কথা শুনে চায়ের দোকানের মালিক ফকির মামা বলেছিল – 'মাস্টারমশাই, এখানেই আপনাদের যতো গোলমাল। আপনাদের কোনটা আনন্দের পাঠ আর কোনটা দুঃখের পাঠ, তা এরা কী করে বুঝবে? এরা তো এখানে বসে ভাবছে আপনারা রোদ পোয়াচ্ছেন আর ছেলেমেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে আপনাদের নিয়ে এই দোকানে বসে কত লোক যে কত কথাই বলে, তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। আপনারা যদি মাঝেমধ্যে ছেলেমেয়েদের মা-বাবাকে নিয়ে নিদেন পক্ষে ৩-৪ মাস পর একবারও আলোচনায় বসেন তাহলে ওরা ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ কী হচ্ছে সেটাও খানিকটা বুঝতে পারে, তাতে ভুল বোঝাবুঝিটা দূর হয়।'

ফকির মামার কথাগুলো শুনে রহমত স্যার চুপ করে গিয়েছিলেন। সে সময় রহমত স্যারকে দেখে অনেক অসহায় মনে হচ্ছিল।

আঠারো

স্যার, একবার নতুন স্যারকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে নানা তর্কাতর্কি চলেছিল। অবশ্য সেদিন নতুন স্যারটা আসেননি। নতুন স্যার থাকলে হয়তো আপনারা তাকে নিয়ে তর্ক করতে পারতেন না। কারণ, লোকটা পার্টির লোক ছিল।

নতুন স্যারটা অনেক দূর থেকে আসতেন। রোজই একটু - আধটু দেরি করে আসতেন, আবার চলেও যেতেন সবার আগে। তার কারণ, 'তিনি রোজই বলতেন দেরিতে বা'র হলে বাস পাওয়া যাবে না। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

নতুন স্যারটা স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে থাকতেন না। স্কুলের বাড়িঘর তৈরির ব্যাপারেও নতুন স্যারকে কোনোদিন মাথা ঘামাতে দেখিনি। সেদিন নতুন স্যারের নানা দোষত্রুটি নিয়ে আপনারা তর্কাতর্কি করছিলেন।

নন্দি স্যার বলছিলেন- 'স্থানীয় এলাকার ছেলেমেয়েদের স্কুল মাস্টারিতে না দিলে এরকমই হবে। বাইরের লোকেদের স্কুলের প্রতি না থাকবে দরদ, না থাকবে এলাকার অভিভাবকদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ। এইতো এক বছর নতুন স্যারের মাস্টারি হয়ে গেল। গ্রামের ক'জন মা-বাবা ওনাকে চিনলেন। কিংবা উনিই বা ক'জন ছেলেমেয়ের অভিভাবককে চেনেন? স্কুলের দরজা ভাঙলো, না জানালা ভাঙলো, 'এসব নিয়ে তাঁর তো কোনো মাথা ব্যথা দেখিনা। স্থানীয় শিক্ষক বলে আমাদেরই যতো দায়।'

নন্দি স্যারের কথাগুলো শুনে রহমত স্যার বলে উঠলেন – 'আপনিতো প্রধান শিক্ষক। এসব কথা তার সামনেই বলতে পারেন। তার পিছনে বলার প্রয়োজন আছে কি? সে কি এসব কথা শুনতে পাচ্ছে? অযথা আমাদের মুখ ব্যথা হচ্ছে।'

ছিদাম বাবু হঠাৎ বলে উঠেছিলেন- 'না না এসব অন্যায় বরদাস্ত করা যাবে না। এর পরদিন উনি আসলে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। হয় উনি এখানে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করুন নয়তো ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমাদের কাছে অনিয়মানুবর্তি শিক্ষক থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান।' ওদিকে রহমত স্যারের কথায় নন্দি স্যার চটেই ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠেন- 'আমি প্রধান শিক্ষক হিসাবে শাসন করতে পারি, কিন্তু তখন যেন আপনারা ইউনিয়ন থেকে এসে আমার উপর চাপ দেবেন না।' রহমত স্যার বলেন – 'ইউনিয়ন কোনোদিন বলেনি যে, তুমি তোমার কর্তব্যে অবহেলা করো। বরং ইউনিয়ন দায়িত্বশীল হতে বলেছে। কেউ যদি দায়িত্বহীন হ'ন তবে সে দায় তাঁর। এ দায় ইউনিয়ন নেবে না।'

নন্দি স্যার পালটা জবাবে বলেন – 'সেকথা সবাই জানেন। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষকদের প্রশাসনিক চাপ দিলে তিনি ইউনিয়নের দ্বারস্থ হন। আর ইউনিয়ন সাহায্য না করলে তাঁরা আবার অন্য ইউনিয়নে যোগ দেন। এই তো সব চরিত্র। সংগঠন বজায় রাখতে গেলে শিক্ষকের অন্যায় মেনে নিতে হয়, আর শিক্ষকের দায়িত্ব বুঝে নিতে গেলে সংগঠন দুর্বল হয়ে যায়। বাস্তবটা অনেকটা এইরকমই।'

রহমত স্যার নন্দি স্যার দুজনেই নীরব থাকেন।

পরের দিন নতুন স্যার স্কুলে আসলে নন্দি স্যারের সঙ্গে প্রথম বচসা বেধে যায়। তারপর আপনারা সব স্যারেরাই তখন এক হয়ে নতুন স্যারকে চেপে ধরে ছিলেন। নতুন স্যার সেদিন কোনো জবাব দিতে পারেননি। কিছুক্ষণ তর্ক করে চুপ করে গিয়েছিলেন। ছুটির পর নতুন স্যার নন্দি স্যারকে একটা দরখাস্ত লিখে ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর বহুদিন তাঁকে আর স্কুলে আসতে দেখিনি। পরে শুনেছিলাম নতুন স্যার বদলী হয়ে অন্য স্কুলে চলে গেছেন। ছিদাম স্যার নতুন স্যারের চলে যাবার খবর শুনে নন্দি স্যারকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন – 'ভালোই হল, দুষ্টু গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ভালো।' নন্দি স্যার রেগেমেগে বলেছিলেন – 'এই গরু যেখানেই যাবে সেই গোয়াল নষ্ট করবেই। আমরা বাঁচলেও, অন্যরা মরবে।'

স্যার, নতুন স্যারটা আসার আগে, আপনারা স্কুলে তিনজন স্যার ছিলেন। মাঝেমধ্যে আপনারা দু'জন স্যার কামাই করতেন। তখন একজন স্যার স্কুলে চালাতেন। রহমত স্যার আর নন্দি স্যার একবার দু'জনেই স্কুলে আসেননি। সেদিন ছিদাম স্যার একা ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ছিদাম স্যার শুধু ক্লাস ফোরের ছেলেমেয়েদের রেখে আর সব ক্লাসের ছুটি দিয়েছিলেন। পল্টু ইচ্ছে করে ছিদাম স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিল –'স্যার, বাড়িতে বাবা জিজ্ঞেস করলে আজ কিসের ছুটি বলবো?'

পল্টুর কথা শুনে ছিদাম স্যার রেগেমেগে বলে উঠেছিলেন – 'দেখছিস না, আজ কোনো স্যার আসেননি। আমি মানুষ, না অন্য কিছু, যে চারটে ক্লাস একা সামলাবো। শুধু ফোরের ক্লাসটা দেখবো তাই বাকীদের ছুটি দিয়ে দিলাম।'

এর কিছুদিন পর দেখলাম, নন্দি স্যার আর ছিদাম স্যার দু'জনেই কামাই করেছেন। সেদিন রহমত স্যার শুধু একা। স্কুল শুরু হওয়ার একটু পরে আমরা ভাবলাম আজও একটা ছুটি পাব। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। প্রার্থনার পর রহমত স্যার সবাইকে নিজের নিজের ক্লাসে গিয়ে বসতে বললেন।

রহমত স্যারের কথা মতো সবাই আমরা যে যার ক্লাসে চলে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি রহমত স্যার ক্লাস ফোর থেকে অর্চনাকে ডেকে নিয়ে ক্লাস ওয়ানের ঘরে ঢুকলেন। তারপর ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েগুলোকে পড়া দিলেন এবং অর্চনাকে ওয়ানের ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনা দেখভাল করার দায়িত্ব দিলেন। ওয়ানের ঘরের কাজ সেরে, একটু পরেই রহমত স্যার টু-এর ঘরে গেলেন। টু-এর ঘরের ছেলেমেয়েদের ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লিখে কাজ দিলেন। তারপর থ্রি এবং ফোরের ঘরে ঢুকে আমাদের সবাইকে লেখার কাজ, পড়ার কাজ, অঙ্কের কাজ দিয়ে আবার ওয়ানের ঘরে চলে গেলেন। এইভাবে সারাদিন ঘুরে ঘুরে রহমত স্যার গোটা স্কুলটা চালালেন।

সত্যি কথা বলতে কি স্যার, সেদিন আমাদের অন্যান্য দিনের থেকে পড়াশোনাটা অনেক ভালো হয়েছিল। আমরা মিলেমিশে নিজেদের মতো পড়াশোনা করে বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম।

টিফিনের সময় বিনোদ বলেছিল- 'স্কুলে অনেকগুলো ফাঁকিবাজ স্যারের থেকে একটা ভালো স্যার থাকা অনেক ভালো।'

স্যার, অনেকদিন আগে বাইরের থেকে যে দু'তিনজন অফিসার এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন অফিসার, সেদিন একাই ক্লাস নিয়ে দেখিয়েছিলেন – কীভাবে একটা স্যারই চারটে ক্লাস সামলাতে পারেন। তাতে পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। রহমত স্যার মনে হয় বাইরের ঐ স্যারের কাছ থেকে এই কায়দাটা শিখে নিয়েছিলেন।

স্যার, ক্লাস ওয়ানের দীপু বলে একটা মেয়ে ছিল। ছেলেটার পায়ে একবার খুব ঘা হয়েছিল। নন্দি স্যার ছেলেটাকে ঘরের এককোণে বসিয়ে রাখতেন। আর চেঁচামেচি করে বলতেন – 'তুই কাল থেকে পায়ে ঘা নিয়ে স্কুল আসবি না। যতদিন না তোর ঘা ভালো হবে ততদিন আসবি না।'

নন্দি স্যারের ধমকানিতে দীপু কেমন ভয়ে কুঁচকে থাকত। কিন্তু দীপু একদিনও স্কুল কামাই করতো না।

আমরা থ্রি-র ছেলেরা যখন ব্যাপারটা জানতে পারি, তখন দীপুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম – 'স্যার তোকে পায়ে ঘা নিয়ে স্কুল আসতে বারণ করে, অথচ তুই স্যারের কথা না শুনে স্কুলে আসিস কেন?'

দীপু মুখ কাঁচুমাচু করে আমাদের বলেছিল – 'স্কুল কামাই করলে মা খুব মারে। তাই স্কুলে চলে আসি।'

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম – 'তুই ডাক্তার দেখাসনি?'

দীপু বলেছিল – 'মায়ের কাছে এখন পয়সা নেই। যেদিন পয়সা হবে সেদিন ডাক্তার দেখাবে বলেছে।'

স্যার, ওর বাবা ছিল না। মা লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালাতো।

সেদিন দীপুর কথা শুনে আমরা সবাই মিলে রহমত স্যারের কাছে দীপুর দুঃখের কথাগুলো বললাম।

রহমত স্যার সেদিন আমাদের বলেছিলেন – 'তোমরা যাও। আমি দেখছি।'

পরদিন দেখলাম, রহমত স্যার প্লাস্টিকের একটা কৌটাতে পাউডার ঔষধ নিয়ে এসে দীপুকে দিচ্ছেন।

রহমত স্যার দীপুর জন্য এতটা করলেন দেখে পল্টু বলেছিল – 'আমরা সবাই মিলে দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা করে চাঁদা তুলে দীপুকে দিই। তাতে ওর মার ডাক্তার দেখানোর সুবিধে হবে। তবে এসব কথা রহমত স্যারকে জানতে দিলে হবে না।'

আমরা চাঁদা তুলবো ঠিক করেছিলাম।।

কিন্তু দীপু এই সাহায্যটা নিতে চায়নি। শুধু বলেছিল – 'স্যারের ওষুধটা লাগিয়ে যদি ভালো হয়ে যায়, তাহলে আর পয়সার দরকার হবে না। তাছাড়া মাকে জিজ্ঞেস না করে পয়সা নিতে পারবো না।'

স্যার, সেদিন আমরা ছোট ছিলাম বলে, এসবের অর্থ বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ এই চিঠি

লেখার সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, সেদিন স্কুলে কে মহৎ ছিল? রহমত স্যার, না আমরা? না কি দীপু? দীপু গরিব হয়েও মায়ের অনুমতি ছাড়া পয়সার জন্য হাত পাতেনি। তবে দীপুর

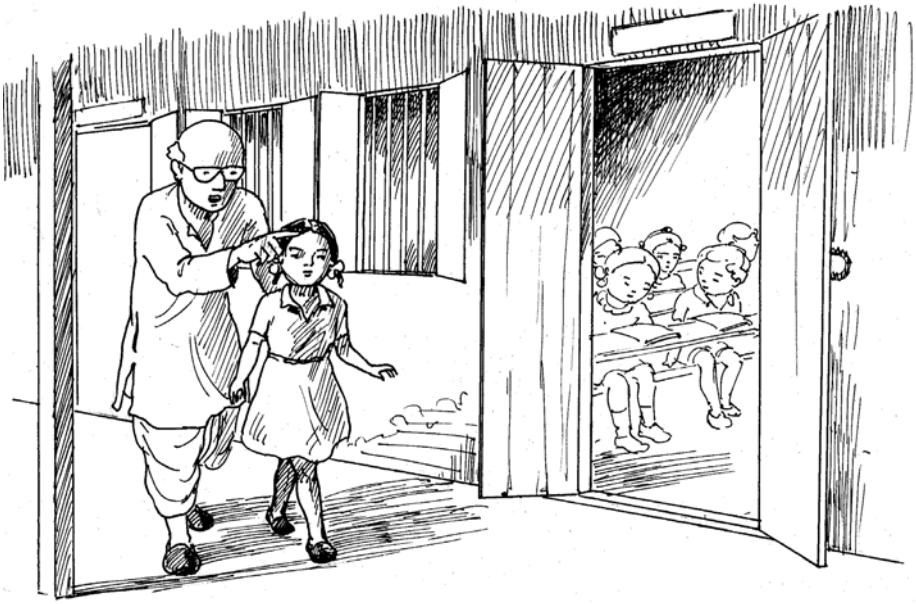

জন্য আমাদের আর চাঁদা তুলতে হয়নি স্যার। কারণ, রহমত স্যারের ওষুধেই ওর পায়ের ঘা ভালো হয়ে গিয়েছিল।

একুশ

স্যার, ছিদাম স্যার একবার পশ্চিমপাড়ার সাত্তার মামার মেয়ের ভালো করতে গিয়ে ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে অবশ্য নন্দি স্যার আর রহমত স্যার মিলে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটাও আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়বে।

একদিন বিকেল বেলা ছিদাম স্যার স্কুল ছুটির পর পশ্চিমপাড়ার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পিছনে আমরা দু-একজন ছেলেমেয়ে ছিলাম। পথে পশ্চিমপাড়ার মোল্লার পুকুরের ঘাটের মাথায় ছিদাম স্যার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাটের মহিলাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন – 'হ্যাগো মেয়েরা, সাবিনা কার মেয়ে বলতে পার?'

ঘাটের মাথায় ছিদাম স্যারকে দেখে পাড়ার মেয়ে বৌ- রা লজ্জায় ঘোমটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল – 'সাবিনা সাত্তারের মেয়ে।'

এইকথা শুনে ছিদাম স্যার পুকুরঘাটের মেয়ে বৌ- দের বলেছিলেন – 'তোমরা একটু ওর

বাড়িতে খবর দেবে তো মা, ওর মেয়েটা বেশ কিছুদিন ধরে স্কুল যাচ্ছে না।'

এই কথা বলেই ছিদাম স্যার বাড়ির পথে হাঁটা দিয়েছিলেন।

আমরা তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ছিদাম স্যারের কথা শুনে একজন মহিলা রেগেমেগে বলে উঠলো – 'মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না, মা-বাপের হুঁস নেই। মাস্টারকে এসে ঘাটের মাথায় বলতে হচ্ছে।' এই কথা বলেই পাশে বসা এক বউকে বলেছিলেন – 'তোর বাড়ির কাছে তো সাত্তারের বাড়ি, একবার ওর বউকে শুনিয়ে দিবি, মেয়ে কেন স্কুলে যাচ্ছে না, সেদিকে একটু নজর দিতে। তা না হলে এই মাস্টার গাঁ শুদ্ধু মানুষকে শুনিয়ে বেড়াবে।'

পরের দিন আমরা যখন ক্লাসে পড়াশোনায় ব্যস্ত, তখন ছিদাম স্যারও আমাদের পাশের ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখি সাত্তার মামা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ঢুকে ছিদাম স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন – 'মাস্টার, আমার মেয়ে স্কুলে আসতে পারেনি- তা নিয়ে আপনি পাড়ার বৌ-ঝি-দের কী বলে এসেছেন? আমার মেয়ের উপর আপনার দরদ কি আমার থেকে বেশি। আমার মেয়ের ভালোমন্দ আমি বুঝবো। এতে আপনি বলার কে? তাছাড়া পাড়ার বৌ-ঝি-রা পুকুরে থালা হাঁড়ি ধুচ্ছে সেখানে আপনার দাঁড়িয়ে কথা বলারই বা কী দরকার?'

সাত্তার মামার চড়া সুরের কথা শুনে ছিদাম স্যার প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অনেকটা অপমানিতও বোধ করছিলেন। কিছু একটা বলে উঠতেও পারছিলেন না। একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন।

এরই মধ্যে চ্যাঁচামেচি শুনে, রহমত স্যার আর নন্দি স্যার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছিদাম স্যারের সামনে হাজির।

রহমত স্যার আর নন্দি স্যারকে সামনে পেয়ে ছিদাম স্যার একটু সাহস পেয়েছিলেন। তারপর ছিদাম স্যার সবার সামনে আগের দিনের ঘটনাটা বলতেই রহমত স্যার গম্ভীর মুখে সাত্তার মামার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'শুনে রাখো – শিক্ষকের কাজ শুধু স্কুলে পড়ানো নয়, কোন ছেলে-মেয়েটি স্কুলে আসছে না, সেটা দেখারও দায়িত্ব শিক্ষকেরই। দিনের পর দিন মেয়েটি স্কুলে না আসলে পড়াশোনায় যখন পিছিয়ে পড়বে, তখন এসে যেন চিৎকার করো না যে, আমার মেয়ে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে কেন? ছিদাম স্যার তোমার মেয়েকে স্কুলে আসার জন্য খবর দিয়ে কোনো অন্যায় করেননি। বাবা হয়ে যেদিকে নজর দিতে পারোনা। শিক্ষকরা সেদিকে নজর দিয়ে কোনো অন্যায় করেননি। শিক্ষক শুধু তোমার মেয়ের গুরুজন নন। গোটা সমাজের গুরুজন। পারলে ছিদাম বাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।'

রহমত স্যরের দাপুটে কথা শুনে সাত্তার মামা মাথা নিচু করে থাকে। নিজের ভুল বুঝতে পারে। ক্ষমা চাইতে ছিদাম স্যারের দিকে হাত বাড়াতেই, ছিদাম স্যার সাত্তার মামাকে বুকে টেনে নিয়ে অভিমানে বলেছিলেন – 'না রে ভাই, আর কোনোদিন তোদের পাড়ায় বলতে যাব না।'

একথা শুনেই রহমত স্যার বলেছিলেন – 'কি ছিদাম বাবু, একটু ধাক্কাতেই পাশ থেকে সরে যেতে চান?'

সাত্তার মামার তখন কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। ছিদাম বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে সাত্তার মামা বলেছিল – 'না মাস্টারমশাই, আপনি যাবেন। এবার থেকে কারো ছেলেমেয়ে স্কুল কামাই করলে আপনারা আমাকেই খবর দেবেন। আসলে, পাড়ার বউগুলো উল্টোপাল্টা বলে আমার মাথা গরম করে দিয়েছিল।'

সেদিন স্যার আমরা শিক্ষক হিসাবে রহমত স্যারের দাপট-টা দেখেছিলাম।

কিন্তু দুঃখের কথা কি স্যার, বিকেলবেলা ছুটির আগে নন্দি স্যার একফাঁকে ছিদাম বাবুর কাছে এসে কানে কানে বলেছিলেন – 'আপনার কী দরকার ছিল মশাই, ওদের পাড়ায় গিয়ে এতো দরদ দেখানোর।'

কী আর বলবো স্যার, আপনারা এক এক জন স্যার, এক এক রকমের ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে সবাই একই নীতি নিয়ে চলতেন না। আপনারা অনেকেই মনে একরকম, আর কাজে অন্য রকম ছিলেন।

বাইশ

স্যার, পল্টু যখন ক্লাস ফোর-টা পাস করলো তখন ওর মনে খুব শখ হয়েছিল, ও হাইস্কুলে পড়বে। পল্টুর শখ দেখে ওর বাবাও ঠিক করেছিল ওকে ফাইভে ভর্তি করে দেবে। কিন্তু হাইস্কুলে ভর্তির গুঁতোগুতিতে না পেরে ওঠায় পল্টুকে শেষমেশ স্কুলের চার দেওয়ালের বাইরে মাঠে-ঘাটেই থাকতে হল।

পল্টুর ভর্তির ঘটনাটা একটু বলি স্যার। ফোর পাস করার পর পল্টুর বাবা ওকে মদনপুর হাইস্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যায়। ওটাই ছিল বাড়ির কাছের হাইস্কুল।

হাইস্কুলের হেড মাস্টার পল্টুর বাবাকে বলেছিলেন – 'ওকে সরাসরি ভর্তি করা যাবে না। ভর্তির একটা পরীক্ষা দিতে হবে।'

পল্টুর বাবা মাঠে ঘাটে খাটা খাওয়া লোক। সোজা-সাপ্টা কথা বলে। ভর্তির পরীক্ষার নাম শুনে মাথা গরম হয়ে যায়। হেড মাস্টারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। হেড মাস্টারও তার নিয়ম থেকে সরবেন না। এই নিয়ে হেড স্যারের ঘরে অনেক তর্কাতর্কি চলে।

হেড স্যারের যুক্তি হল – আমার স্কুলে যা ঘর আছে তাতে এলাকার সব ছেলেমেয়েকে ফাইভে ভর্তি করা যাবে না। ফলে আমাকে ভর্তি পরীক্ষা করে ছেলেমেয়ে বেছে নিতে হবে।

এদিকে পল্টুর বাবার মেঠো যুক্তি হল – 'আমার ছেলে ওয়ান পাস করে টু-এ উঠেছে, টু পাস করে থ্রি-তে উঠেছে, থ্রি পাস করে ফোরে উঠেছে। আর এখন সে যখন ফোর পাস করেছে

তখন ফাইভে তো নিতেই হবে। তার আবার পরীক্ষা কিসের? এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠে নতুন করে তো কোথাও ভর্তির পরীক্ষা দিতে হয় নি। তাহলে ফাইভের বেলাতেই বা পরীক্ষা দিতে হবে কেন? আমার ছেলে খারাপ হলে, মাস্টাররা ফোর না পাস করালেই পারতো। ফোর যখন পাস করিয়েছে তখন ফাইভে তো ওকে ভর্তি নিতেই হবে।'

পল্টুর বাবার মেঠো যুক্তি শুনে হেড মাস্টার অবাক। কিন্তু হেড স্যার তার নিয়ম থেকে এক চুলও সরেননি। অগত্যা পল্টুকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আর তার ফল বেরুলে দেখা গেল, পল্টুকে মাঠে গরুই চরাতে হবে। এই ঘটনায় মনের খেদে পল্টুর বাবা গেঁয়ো অভিজ্ঞতায় বলেছিল – 'প্রাইমারিটার সঙ্গে হাইস্কুলটা লাগানো থাকলে তোকে নিয়ে এই ঝামেলা হতো না। তুই একটানা ফাইভে যেতে পারতিস।'

তেইশ

স্যার, একবার পাড়ায় - পাড়ায় সাক্ষরতার ঢেউ উঠেছিল। ছেলে বুড়ো সবাইকে পড়তে যেতে হবে। এই সাক্ষরতা নিয়ে প্রায়ই দেখতাম পাড়ায় - পাড়ায় মিটিং হচ্ছে। বাবুদের ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতাম খাতা কলম নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিরক্ষর লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাইকে লেখাপড়া শেখাতে পার্টির লোকেরা, পঞ্চায়েতের লোকেরা একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল।

বাবারা বলতো- এই প্রথম দেখলাম গরিবের শিক্ষার জন্য সমাজের সবার উঠে পড়ে লাগা। মাঝে মধ্যে দেখতাম সরকারের বড় বড় অফিসার বাবুরা লাল আলোর গাড়ি নিয়ে পাড়ায় এসে মিটিং করছেন। সাক্ষরতা নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। চারিদিকের এইসব চাপাচাপিতে পাড়ার অনেকেরই তখন সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। ভেবেছিল কাজ চালানোর মতো যতটুকু শেখা যায়, ততটুকুই লাভ। এইভেবে পাড়ার বুড়ো থেকে ছেলে-ছোকরা অনেকেই সাক্ষরতা কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছিল। বাবুদের ছেলেমেয়েগুলো ভি. টি. মাস্টার হয়ে সবাইকে পড়াতো। আমাদের পাড়ায় মেয়ে-বউগুলো মদন খুড়োর দাওয়ায় পড়তো। আর ছেলেরা অন্য জায়গায় পড়তো। শুধু একটা জায়গা ছিল, যেখানে জায়গার অভাবে মেয়ে-মরোদ সবাই এক জায়গায় পড়তো। সন্ধ্যেবেলা গ্রামে পড়ালেখার একটা জমজমাট হাওয়া উঠেছিল।

এই সময় হঠাৎ আবার শোনা গেল, পাড়ার যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়নি কিংবা মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সকলকে স্কুলে ভর্তি হতে হবে। আমাদের পাড়ায় এখন যারা আমাদের থেকে বড়, তারা অনেকেই তখন স্কুল ছেড়ে দিয়ে নানা রোজগারের কাজ করতো। এর মধ্যে রবি মামা, নগেন দা, রহিম দা সবাই ছিল। এখন আমরা যা করছি – এই রকমই ওরাও এখানে ওখানে কাজ করতো। আবার অনেকেই ছিল, যারা সারাদিন আনন্দে মার্বেল গুলি খেলতো, পুকুরে সাঁতার কাটতো কিংবা খাল-বিলে মাছ ধরে বেড়াতো। একসময় চারিদিকের চাপে পড়ে সবাইকে সব কিছু ফেলে স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছিল। এর ফলে কারও কারও বাবা মা-র সংসারে অসুবিধাও হয়েছিল। কারণ ছেলেমেয়ের বিশ টাকা রোজগারটাও

অভাবের সংসারে অনেক ঠেকা দিত। খাল-বিলের দুটো চুনো মাছও সংসারে সবার পুষ্টি যোগাতো।

পল্টু স্কুল ছেড়ে দেওয়া দলের একজন ছিল। ও চকের মোড়ে 'মা-কালী হোটেলে' ডেলি কুড়ি টাকা রোজে কাজ করতো। চারিদিকের চাপে পড়ে পল্টুকেও হোটেলের কাজ ছেড়ে পুনরায় স্কুলে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু স্কুলে এসে ওর কী লাভ হল স্যার? এমনিতে পড়া ছেড়ে দিয়ে পল্টু অনেকটা ভুলে গিয়েছিল। তারপর দু' বছর পর আবার ভর্তি হয়ে ক্লাসে ছোটোদের সঙ্গে ওর কিছুতেই খাপ খেতো না। ক্লাসের মধ্যে পল্টু বয়সে সবার থেকে বড় ছিল, অথচ পড়ালেখায়

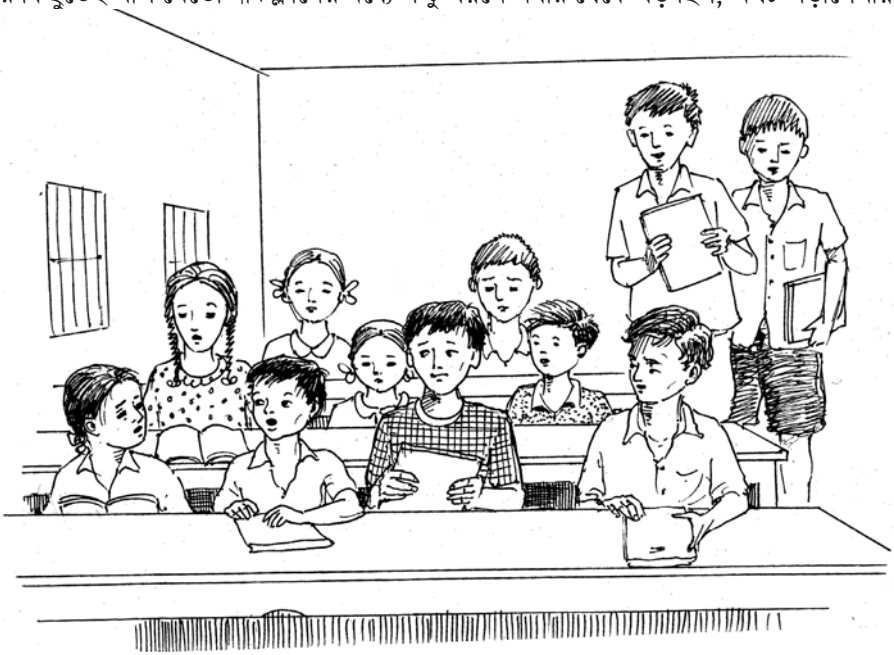

সবার থেকে কম। ওর মনে একটা দো-টানা ভাব চলতো। ওর ভুলে যাওয়া পড়াগুলো আপনারা আলাদা করে দেখিয়ে দিতেন না। ফলে সমাজের চাপে পড়ে ওকে ভর্তি হতে হলেও, যে কারণে ভর্তি হওয়া তার কোনো লাভ হয়নি।

পল্টু আমাদের বলেছিল – 'জানিস, আমি যখন স্কুলে পুনরায় ঢুকলাম তখন ভালো ছেলেমেয়েগুলোর পড়ার দৌড় দেখে মনে হতো- আমি যেন কচ্ছপ, আমাকে হরিণের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।'

স্যার, সমাজের চাপে পড়ে যখন স্কুল ছেড়ে দেওয়া দলটা রোজগারের ঝুড়ি ফেলে পুনরায় স্কুলে এল, তখন পড়াশোনাতো হলই না, উল্টে রোজগারের পথটাও বন্ধ হয়ে গেল। সমাজের চাপে স্কুলে ঢুকলাম। কিন্তু আপনারা আমাদের ধরে রাখতে পারলেন না। ধীরে ধীরে সমাজের চাপটাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর কেউ-ই খোঁজ রাখে না। না আপনারা, না সাক্ষরতার

দিনের মানুষগুলো। আমাদের ভালো আপনারা চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ ভালোটা কেউ-ই দেখলেন না। এখন মনে হয়, সত্যিই কি আমাদের কথা ভাবা হয়, না কি এসব লোক দেখানো একটা কিছু?

অবশ্য আমাদের মা বাবা-রাও নিজেদের ভালো মন্দ বুঝতো না। গ্রামের আর পাঁচটা বাড়ির ভালো অবস্থা দেখেও শিখতো না। এরা ভেবেই রেখেছিল, বাপ - ঠাকুর দাদারা যেমন চলে এসেছে, আমাদেরও তেমনটি-ই চলতে হবে।

স্যার, গরিবগুলো গ্রামের একদিকে থাকে বলে, এদের ভাবনাটাও গরিবের মতো থাকে। বড় বড় ভাবনাগুলো গরিব পাড়ায় গড়িয়ে আসে না, আবার গজিয়েও ওঠে না। আমাদের গরিব পাড়ায় সব কিছুই গরিব। আর এই অবস্থা দেখে মনে হয়- গরিবি মানে একটা আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় আমাদের যেমনি থাকার কথা, ঠিক তেমনিই থেকে গেলাম।

চব্বিশ

এই চিঠি লেখার সময় পল্টু মাঝেমধ্যে খেই ধরিয়ে দিতো। সবই জীবন যন্ত্রণার কথা। পল্টু বললো – 'জানিস, আমরা যেন পুকুরের মাছ। মাঝে মধ্যে জেলেরা জাল নিয়ে যেমন তাড়িয়ে বেড়ায়' আমাদেরও সেই একই অবস্থা। একবার সাক্ষরতার সময় তাড়িয়ে বেড়ানো হল। এখন আবার সর্বশিক্ষার সময় আমাদের খোঁজে ছুটোছুটি শুরু হল। সবাই আমাদের পড়ানোর জন্য জোরাজুরি করে। অথচ আমরা কেউ খেলতে ভালোবাসি, কেউ সাঁতার কাটতে, কেউ তীর ছুঁড়তে, কেউ আবার দৌড়াদৌড়িতে ওস্তাদ। আমাদের পছন্দটা কেউ বুঝলো না। শুধু নিজেদের ভালোলাগাটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিল।

স্যার, চৌরাস্তার ধারে 'মা-কালী' হোটেলে রবিবারটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিভি দেখা আমাদের নিত্য অভ্যাস। একবার দেখলাম সাদা কালো নানা চেহারার অনেক মানুষের মধ্যে কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ তীর ছুঁড়ছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বর্ষা ছুঁড়ছে আবার কেউ কুস্তি লড়ছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল – আরে, এসব তো আমরাও পারি। হায় কপাল! এসবও যদি কেউ একটু ভালো করে শিখিয়ে দিতো, তবে কোথাও আমাদের একটা জায়গা হতো। স্যার, না হল লেখাপড়া শেখা, না হল খেলাধুলোটা।

স্কুলে থাকার সময় দেখেছি, বছরে একবার আপনারা খেলাধুলো নিয়ে মাতামাতি করতেন। মাসখানেক ধরে এই মাতামাতি চলতো।

পড়াশোনা তখন শিকেয় উঠতো। ঐ মাসটা আমাদেরও বেশ ভালো লাগতো। কারণ পড়াশোনায় ভালো না হলেও, খেলাধুলোয় আমরা পটু ছিলাম। আর স্কুলের মান রাখার জন্য তখন আমরা আপনাদের কাছে খুব প্রিয় ছাত্রছাত্রী হয়ে যেতাম। পড়নেওয়ালারা তখন আপনাদের পিছনে চলে যেতো। কিন্তু যাই-ই হতো, তাও ঐ একমাস। তারপর যে কে সেই।

আমাদের খেলাধুলোর পিছনে আপনাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। মাঠে ঘাটে লাফঝাঁপ মেরে, গরু ছাগলের পিছনে ছুটোছুটি করে যেটা শিখেছিলাম, সেটাই বছরের শেষে কাজে লেগে যেতো।

পল্টু মাঝেমধ্যে ওর বাবার জন্য মাথায় করে মাঠে জলখাবার নিয়ে যেতো। একবার জলখাবার নিয়ে যাবার সময় একটা ছোট নালা লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে নালার জলে পড়ে গিয়েছিল। সেদিন ওর বাবার দুপুরের অন্ন জোটেনি।

মনের দুঃখে পল্টু পরে সেই নালাটা পার হবার অনেকদিন চেষ্টা করেছিল। শেষমেশ পার হতে পেরেছিল। দিন কয়েক পর, ওর মা আবার জলখাবার পাঠানোর সময় পল্টুকে গামছা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল – 'গামছা পরে নালা পার হবি।' কিন্তু পল্টু মায়ের দেওয়া গামছা না নিয়ে বাবার জলখাবার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। মা-কে ভরসা রাখতে বলেছিল।

পল্টুর নিজের চেষ্টায় নালা পার হবার ক্ষমতা খেলার মাঠে লং জাম্প মারার সময় কাজে লেগেছিল। যেটা দেখে আপনারা হাততালি দিয়েছিলেন। যদিও ওর সাফল্যের পিছনে আপনাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

খেলার সরঞ্জাম কেনার কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। খেলাধুলোর চর্চার জন্য স্কুলে লং জাম্প দেবার মাটিই খোঁড়া থাকতো না। কিংবা হাই জাম্প মারার জন্য দুটো খুঁটি। বছরে একবার শুধু আমাদের ক্ষমতার দৌড় দেখার জন্য আপনারা প্যান্ডেলের তলায় বসে মাইকে নানা কথা বলতেন। আমরা কেউ দৌড় ঝাঁপে এগিয়ে গেলে একটা প্লাস্টিকের বালতি কিংবা স্টিলের

থালা হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিতেন।

যাই হোক স্যার, আমাদের পড়াশোনা আর খেলাধুলো সবটা মাঠেই আটকে গেল।

স্যার, আমি বাদল, আমাদের দলে আমিই কেবল ছঁ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। আমাদের হাইস্কুলে একটা খেলাধুলোর মাস্টার এসেছিলেন। তিনি কিন্তু খেলাধুলোকে পছন্দ করতেন না। তিনি ক্লাসে পড়াতেই বেশি ভালোবাসতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো, তিনি বোধ হয় খেলাধুলোর মাস্টার বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন। সরকার খেলাধুলোর মাস্টার দিল অথচ স্কুলে প্রতিদিন এসবের চর্চা হল না।

পঁচিশ

স্যার, আমাদের বিদ্যালয় জীবনটা তো সুখের ছিলই না।কিন্তু আপনারাও সুখী ছিলেন না। আপনাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের নানা বিষয় নিয়ে দ্বন্দ হতে দেখতাম। রহমত স্যারটা অনেক ভালো কাজ করতে চাইতেন। কিন্তু অন্য স্যারেরা রহমত স্যারের মতে সায় দিতেন না। ফলে রহমত স্যারের অনেক ভাবনা কাজে লাগতো না। রহমত স্যার তাঁর দুঃখ এবং ভালো ভাবনার কথাগুলো মাঝেমধ্যে কমিটির লোকজনদের বলতেন। আমরা আড়াল-আবডাল থেকে শুনতাম। কিন্তু কমিটির লোকেরাও এক একজন শিক্ষকদের দিকে ভাগাভাগি হয়ে থাকতেন। তাই রহমত স্যারের ভালো ভাবনা ভাবনাতেই থেকে যেতো, কাজের কাজ কিছু হতো না।

একবার মনে হয় সরকারের কোনো নির্দেশছিলো তাই মা-বাবাদের ডেকে সেদিন 'শিক্ষক দিবস' পালন করা হয়েছিল। রহমত স্যার সেই সুযোগটি ছাড়েন নি। তিনি ঠিক করেছিলেন শিক্ষক দিবসে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের মা-বাবারাই বেশি বলবে। শিক্ষকরা শুধু শুনবেন। হলোও তাই। সেদিন বিদ্যালয়ে অনেক অভিভাবক জুটেছিলেন।আপনারা সেদিন ভয়ে ভয়ে ছিলেন। ভেবেছিলেন – মা-বাবারা হয়তো আপনাদের তুলোধনা করে ছাড়বেন। আমরাও তাই ভেবেছিলাম। রহমত স্যারও চেয়েছিলেন আপনাদের সম্পর্কে আমাদের মা-বাবারা খোলাখুলি কিছু বলুক। কিন্তু তা হয় নি। আমাদের অনেকের মা-বাবা সেদিন আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গিয়েছিলেন। আপনাদের অনেক প্রশংসা হলো। কিন্তু আমাদের পোড়া কপালের দিকে কেউ ঘুরে তাকান নি। অবশ্য ঐ দিনের সভায় বেশির ভাগ অভিভাবকরাই লেখাপড়া জানা লোকজন ছিলেন। আমাদের মা-বাবা রা এমনিতেই লেখাপড়া জানতো না। তারপর দেখলো মনিবরা যখন কথা বলছে, তখন তাদের আর কি বলার আছে। আমাদের দু- একজনের মা-বাবা একটু কড়া কথা বলবো বলে ভেবেছিল , কিন্তু অন্যের মা-বাবারা বলেছিল মনিবদের বিরুদ্ধে বলে কিছু লাভ নেই। বরং তাতে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হবে। ফলে মা-বাবারা মনের ক্ষোভ গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল।

সেদিন রহমত স্যার সভার শেষে একটু ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি নিজেদের অনেক সমালোচনা করেছিলেন। আমাদের মতো গরিব পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের পিছিয়ে পড়ার কারণ বলতে

চেয়েছিলেন। আমাদের কথা বলার জন্য আমাদের মা-বাবাদের কারো কারো একটু ভালো লেগেছিল। কিন্তু সবার সেটা সহ্য হয় নি। সভার শেষে আপনাদের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেধে

গিয়েছিল। রহমত স্যারকে সব শিক্ষকরা একটু বকাবকি করেছিলেন। কিন্তু রহমত স্যার বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'অভিভাবকগণ আমাদের প্রশংসা করতেই পারেন।কারণ আজ শিক্ষকদিবস। আমাদের সন্মান জানানোর দিবস। কিন্তু সন্মান পাবার জন্য নিজেদের তৈরি করতে হয়। অসন্মানের কাজ করবেন আর সন্মান পাবার দাবীদার হবেন এটা একটা ভ্রষ্টাচার। অভিভাবকগণ আমাদের প্রশংসা করবেন আর আমরা আমাদের আত্মসমালোচনা করব তাতে অভিভাবকগণ বরং আমাদের আরও বেশি সন্মান জানাবেন। আমাদের সততার মর্যাদা দেবেন। ভুয়ো সন্মান পেয়ে কোনো লাভ নেই।' আমরা বাইরের জানালা দিয়ে আপনাদের এইসব ঝগড়ার কথা শুনেছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়, আমাদের পাড়ায় দুগ্‌গা তলায় আমাদের বাবাদের মধ্যেও আপনাদের শিক্ষক দিবস নিয়ে ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। আমাদের বাবাদের কেউ কেউ ক্ষোভের কথা বলতে না পেরে, বুকের জ্বালা বার করেছিলেন। কিন্তু তার আগে যা হবার সে তো হয়েই গেছে।

ছাব্বিশ

স্যার, বিদ্যালয়ে আপনারা মাঝেমধ্যে সাফাই অভিযান করাতেন। সেই সাফাই অভিযানেও আমরা যে কি কষ্ট পেতাম, সেটা আজ আপনাদের বলি। প্রথমবার যখন সাফাই অভিযান করানো হল, তখন আপনারা আমাদের নানা দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রথমবার আমরা দেখলাম- বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের হাল্কা হাল্কা কাজ দিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে কেবল বেঞ্চগুলোকে ঠিকমত সাজানো। অফিসের বইপত্র সাজানো। কিন্তু আমাদের মত গরিব পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভাগে পড়েছিল বিদ্যালয়ের উঠোন ঝাঁট দেওয়া, ক্লাসঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে, পরে জল দিয়ে পরিষ্কার করা। বিদ্যালয়ের ছাদ পরিষ্কার করা এইসব। দ্বিতীয় বারও যখন সাফাই অভিযান হল, তখনও আমাদের দলের এই কাজের দায়িত্ব পড়েছিল। কিন্তু তৃতীয় বার যখন সাফাই অভিযানের ব্যবস্থা হল, তখন দেখলাম রহমত স্যার একটু বেঁকে বসেছেন। তিনি অন্য স্যারেদের বললেন 'এইবার ছাত্রছাত্রীদের দল ভেঙে নতুন করে দল করে কাজের দায়িত্ব নতুন করে বন্টন করা হ'ক।' এতে আপনাদের মধ্যে বেশ বচসা বেধে গিয়েছিল। কয়েকজন স্যার বলেছিলেন- 'সব কাজ সবাইকে দিয়ে হবে না।' আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন – 'এরা মাঠে ঘাটে নানা কাজ করে, এদের ক্ষমতা বেশি, এদের একটু কঠিন কাজ দেওয়া যেতেই পারে। অন্যদের দিয়ে এসব কাজ হবে না।' এতেই রহমত স্যার বেঁকে বসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 'সবাইকে সব কাজের অভ্যাস করাতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের কাছে সমান। তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ টানা ঠিক হবে না। তাছাড়া এখানে ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। নানা পেশার মানুষের কষ্টটা ছাত্রছাত্রীরা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুক। বিদ্যালয়কে নিজের মতো করে ভাবতে শিখুক।'

কিন্তু হায় আমাদের কপাল, আমরা আমাদের কাজের ভাগাভাগি না করলেও, আপনারাই আমাদের ভাগ করাতে গিয়ে সাফাই অভিযানটাই কয়েকমাস বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সাতাশ

স্যার, এবার শেষ কথায় আসি। আমাদের এই চিঠি লেখা যেদিন শেষ হয়ে এসেছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই মিলে কুবীর মোড়লের বৈঠকখানায় যখন চিঠিটা শেষ বারের মতো এক ঝলক দেখে নেবার জন্য সবাই বসেছি, ঠিক সেই সময় ছিদাম স্যার কুবীর মোড়োলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কুবীর মোড়োল তখন বাড়ি ছিল না। কিন্তু পোড়ো বারান্দায় আমাদের হাতে কাগজপত্র দেখে হঠাৎ আমাদের কাছে এসে হাজির। এসেই জিজ্ঞেস করলেন – 'এখানে তোরা কী করছিস?' কুবীর মোড়োলের আসতে দেরী দেখে মনে হয় ছিদাম স্যার সময় কাটাতে আমাদের কাছে এসেছিলেন। যাই হোক, উনি এসে আমাদের সামনে পাতা চটে বসে পড়লেন। আমরা পড়লাম মহা বিপদে। ভাবছি কী করি, কী করি।

এমন সময় পল্টু কানে কানে বললো – 'যা হয় হবে, স্যারকে চিঠিখানা একবার পড়ে শুনিয়ে

দে। তারপর তো পাঠানো হবেই।'

ছিদাম স্যারেরও কৌতূহল দেখে আমরা বললাম – 'স্যার আমরা তো এখন সবাই স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু স্কুলে আমরা কেমন থাকতাম, আপনারা আমাদের কী চোখে দেখতেন, সেগুলো একটা চিঠি লিখে আপনাদের জানাচ্ছি।'

ছিদাম স্যার আমাদের কথাটা শুনে মুচকি হেসে একটু হাল্কা মেজাজে বললেন – 'তাই নাকি। তা শুনি কী লিখেছিস। তোদের স্কুলের বিদ্যে তো দেখেছি, এবার স্কুলের বাইরের বিদ্যেটা একটু দেখি।'

ছিদাম স্যার কথাটা তাছিল্য ভাবে বললেও আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা শুনতে চেয়েছিলেন। আমি বাদল সেদিন ছিদাম স্যারকে গোটা চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলাম।

স্যার, চিঠিটা যখন আমি একটু একটু পড়ছিলাম, তখন দেখছিলাম, ছিদাম স্যার যেন একটু গুম হয়ে পড়ছিলেন। শেষমেশ দেখলাম উনি ক্রমশ পাথরের মতো স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু দু'বার দেখেছিলাম মাথাটা একটু নীচু করে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ দু'টোকে চেপে ধরতে। চিঠিটা পড়ার সময় ছিদাম স্যার তিনবার আমাকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আবার পড়তে বলেছিলেন। সেটা হল – বিনোদকে মারা, ইসমাইলকে অহেতুক স্কুল থকে তাড়িয়ে দেওয়া আর সাত্তার কাকার সঙ্গে ঝগড়ার জায়গাটা।

স্যার, আমাদের চিঠি পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছিদাম স্যারকে দেখেছিলাম কিছুক্ষণ গালে হাত রেখে আমাদের সামনে থাকা লম্ফ আলোটার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকতে।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন – 'তোরা কি আর একবার স্কুলে ভর্তি হবি বাবা। তাহলে আমিও শিক্ষক জীবনটা নতুন করে শুরু করতে পারি। তোদের আশীর্বাদ করি। তোরা আজ এই সন্ধ্যেবেলা এক নতুন শিক্ষকের জন্ম দিলি। আমার শিক্ষক জীবনটা অনেক দূর গড়ালো ঠিকই। কিন্তু কোনোদিন পিছন ফিরে দেখিনি। আজ সেটা দেখার সুযোগ হল।'

স্যার, ছিদাম স্যার যাবার সময় পোড়ো বারান্দার শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে একবার বলেছিলেন – 'যা হবার হয়ে গেছে। বাকী জীবনটা শিক্ষক হিসাবে যা করার, তা করে আমাদের প্রায়শ্চিত করতে দাও।'

আমরা সবাই মিলে বারান্দার নীচে নেমে ছিদাম স্যারকে প্রণাম করে একটা অনুরোধ করেছিলাম – 'স্যার, এখন যারা স্কুলে রইলো তারা যেন আমাদের মতো অচল মানুষ না হয়ে যায়, তা একটু দেখবেন। ওদের অন্তত সরস্বতীর বাড়িটা চিনিয়ে দেবেন। লক্ষ্মীর বাড়ি ওরা নিজেরাই খুঁজে নেবে।'

ছিদাম স্যার হঠাৎ এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে আমাদের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন – 'কথা দিলাম, শিক্ষক হিসাবে আমাদের নতুন করে দায়িত্ব বুঝে নিতে দাও।'

ছিদাম স্যার চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের যা কথা দিয়েছিলেন তার খেলাপ করেননি।

আমার পিসতুতো বোন নমিতা একবার বলেছিল – 'ছিদাম স্যার এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। ক্লাসে এসে প্রথমে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন। একপাক ঘুরে খোঁজ নেন কে কি খেয়ে স্কুলে এসেছে। শুনেছি, পয়সার অভাবে কেউ বই খাতা কিনতে না পারলে গোপনে সাহায্য করেন। শুকনো মুখ দেখলে মাথায় হাত দিয়ে টেনে নিয়ে কষ্টটা বুঝতে চান।

এখন এও শুনতে পাই যে, ছিদাম স্যার আর রহমত স্যার মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। নন্দি স্যার একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। স্কুলের যা কিছু ভালোমন্দ ছিদাম স্যার আর রহমত স্যার মিলেই করেন। শুনলাম, আপনারা নাকি কয়েক মাস পরপর মা-বাবাদের ডেকে ছেলেমেয়েদের শরীরের ভালোমন্দ, পড়াশোনার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন। এতে এখনকার মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের ভালোমন্দ বুঝতে শিখছে। যেটা আমাদের সময়ে অভাব ছিল। ক্লাসে নাকি আপনারা এখন পিছনের বেঞ্চের ছেলেমেয়েদের দিকে বেশি নজর দেন। বিদ্যালয়ের ভিতরে গাছ লাগানো, বাগান তৈরি সব কিছুতেই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন। ওরাই যেন স্কুলের মালিক। আপনারা একসঙ্গে সবাই মিলে বিদ্যালয়ে সাফাই অভিযান করেন। ছিদামবাবু নিজের হাতে জল নিয়ে বিদ্যালয়ের নতুন বাথরুম পরিষ্কার করেন। দুপুরের খাবারের জন্য নিজের হাতে ছেলেমেয়েদের পরিবেশন করেন। বিদ্যালয়ের প্রাচীর দেওয়া, মেরামতির কাজে সরকারের কাছ থেকে টাকা পয়সা এলে, মা-বাবাদের ডেকে তাদেরই কাজ করার দায়িত্ব- ভার দিয়ে দেন। তাঁরা না পারলেও তাঁদের সামনে রেখে আপনারা পিছন

থেকে সব কাজে তাঁদের এগিয়ে দেন। মা-বাবাদের মধ্যেও এখন স্কুলের প্রতি মালিক - মালিক ভাব এসেছে। গ্রামের লোকেদের কাছে চাঁদা তুলে ছেলেমেয়েদের মাথার উপর ফ্যান লাগিয়েছেন। সরকারি পয়সার উপর ভরসা না করে দৈনন্দিন খাবারের থালায় একটু ভালো কিছু দেবার জন্য স্কুলে সব্জি বাগান করেছেন। স্যার, এখন পাড়ার যেসব ছেলেমেয়েরা আপনাদের পেলো তারা সত্যিই অনেক ভাগ্যবান। তবুও ভালো যে দেরীতে হলেও ভালোটা তো শুরু হল। আমাদের মতো গরিব-গুরবোগুলো জীবনে নতুন পথের সন্ধান পেলো।

স্যার, আপনাদের ভালো কাজ নিয়ে মাঠে ময়দানে এখন আলোচনা হতে দেখি। একদিন মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বাবাদের মধ্যেও আলোচনা হতে দেখলাম – আপনাদের গভীর দরদের কথা। মাঝে মধ্যে ভাবি, স্যার আপনাদের অন্তরে এতো ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল সেটা আমরাই কেবল দেখতে পেলাম না। এইসব কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে একদিন আলোচনা হচ্ছিল, তখন পল্টু বললো, 'আমাদের আমলে স্যারেদের মধ্যে ভালো মানুষ দেখতে পাইনি, কিন্তু স্যারেদের অন্তরে ভালো মানুষতো আমরাই সৃষ্টি করলাম।'

ছিদামবাবু এখন পাড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে পাড়ার মেয়ে বউরা সামনে এসে দু'দন্ড দাঁড়িয়ে কথা বলেন। তাঁর শরীরের খোঁজ খবর নেন। ছিদামবাবু যেন এখন সব ছেলেমেয়ের পিতা। একদিন শুনলাম ছিদামবাবুর বৃদ্ধা বিধবা মা ছিদামবাবুকে প্রায়ই দেরীতে বাড়ি ফেরার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। কেন না, এ অভ্যাস ছিদামবাবুর আগে কোনোদিন ছিল না। ছিদাম বাবু তাঁর মাকে বলেছিলেন –'মা, এই গ্রামের অনেক মায়ের আব্দার মেটাতে গিয়ে তোমার কাছে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যায়'। সেদিন ওনার বৃদ্ধা মায়ের আশীর্বাদের হাত উঠেছিল ছিদামবাবুর মাথায়।

স্যার, ছিদামবাবু আর রহমত স্যার মিলে আপনারা কেবল স্কুলটাকেই বদলে ফেলেন নি। গোটা গ্রামটাকেই কেমন গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন। আর সেই সাত্তার মামাকে দেখেছি আপনাদের দুজন স্যারের কাজের ফাই ফরমাশ পেলে আঁকুপাঁকু করে তা করে দেবার চেষ্টা করে। স্যার, আপনারা বদলে গেলেন, স্কুলটা বদলে গেল, সাত্তার মামা বদলে গেল। শুধু আমরাই বদলে যাবার সুযোগ পেলাম না। তবু ভালো যে, বদলে যাওয়া একটা ভালো গাঁয়ে অন্তত আমরা সবাই মিলে থাকতে পারবো। দেশের ভালো নেতার মতো, আপনারা গ্রামের নেতা।

একদিন হঠাৎ বাবা আমাকে বলছিল – 'ইদানিং ছিদাম বাবুকে সন্ধ্যেবেলা আমাদের গরিব পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে দেখি। জন-মুনিষের খোঁজে নিশ্চিত নয়। তা হলে কেন? পরে ফকির মামার দোকানে বসে বাবা জানতে পেরেছিল ছিদাম বাবু মাঝেমধ্যে সন্ধ্যেবেলা গরিব পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়ার পরিবেশ দেখে বেড়ান।

পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোকে বলতে শুনেছিলাম – 'রহমত স্যারের সঙ্গে ছিদাম বাবুর ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে। স্কুল ছুটির পর দু'জনে মিলে বারান্দায় বসে স্কুলের ভালোমন্দ নিয়ে কত কথাই না বলেন।

স্যার, সুখ জিনিসটা গরিবের কপালে সহ্য হয় না। ছিদাম বাবু যখন আমাদের মতো গরিবদের অনেক কাছে এলেন তখনই একদিন হঠাৎ ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিলেন। এটাই বোধহয় গরিবের কপাল।

স্কুলে ছিদাম বাবুর স্মরণসভায় গরিব-গুরবো সবাই গিয়েছিলেন। স্মরণ সভা থেকে ফিরে এসে বাবা বলেছিল – 'ছেলেমেয়েগুলো ছিদামবাবুকে মাস্টারমশাই হিসাবে আর কোনো দিন পাবে না, তবে মৃত্যুর পর পেয়ে গেল পিতা হিসাবে। কারণ মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। আমরা বাবা হয়ে যা করতে পারিনি। ছিদাম বাবু মরণের পর সেই দায়িত্ব পালন করবেন।'

স্যার, ছোটদের কোনো আশীর্বাদ বড়দের জন্য হয় না জানি। তবু রহমত স্যারের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আর ছিদাম স্যারের জন্য কেবল তাঁর আত্মার শান্তি কামনা নয় বরং ঈশ্বরকে বলি ছিদামবাবু যদি আবার মানুষ রূপে জন্মান তবে তিনি যেন শিক্ষকই হন। ঈশ্বর ছোটদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন নিশ্চিত।

স্যার, স্কুলে প্রার্থনার সময়কার একটা কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে, তা হল- 'পিতৃদেবো ভব গুরুদেবো ভব'।

আমাদের চিঠি পড়ে মনে ব্যাথা পেয়ে থাকলে, আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন।

ইতি –

আপনাদের হারিয়ে যাওয়া হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীরা

AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড, দক্ষিণ, কলকাতা- ৭০০০৩১, ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯